রমযানুল মুবারকের সওগাত

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.
শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

রমযানুল মুবারকের সওগাত

মূল

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)

শাইখুল ইসলাম মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

অনুবাদ

মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ

সাবেক উস্তাদ, জামিয়া দারুল উলূম মতিঝিল, ঢাকা

নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আল কাউসার

সংযোজিত

রোযা ও যাকাতের মাসায়েল

মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ

মুহাদ্দিস, জামিয়া আরাবিয়া ফরিদাবাদ, ঢাকা

খতীব, সিদ্দিক বাজার জামে মসজিদ, ঢাকা

মাকতাবাতুল আশরাফ

(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)

১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.banglakitab.weebly.com

সূচীপত্র

www.islamfind.wordpress.com

রমযানুল মুবারকের সওগাত

মূল ঃ হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)
শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
অনুবাদ ঃ মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১১-১৪১৭৬৪

তৃতীয় মুদ্রণ ঃ জুন ২০০৭ ঈসায়ী
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ নভেম্বর ২০০২ ঈসায়ী
প্রথম মুদ্রণ ঃ নভেম্বর ২০০০ ঈসায়ী

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতায
গ্রাফিক্স ঃ নাজমুল হায়দার
দি লাইট, ঢাকা

মুদ্রণ ঃ **মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স**
(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)
৩/খ, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN : 984-70048-0011-0

মূল্য : দুইশত টাকা মাত্র

RAMJANUL MUBARAKER SAWGAT

By : Hakimul Ummat Hazrat Maulana Ashraf Ali Thanobi (R.)
Shaikhul Islam Mufti Muhammad Taqi Usmani
Translated by : Maulana Sharif Muhammad

Price: Tk. 200.00 US$ 13.00

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

উৎসর্গ

আব্বা

আলহাজ্জ গোলাম রব্বানী সাহেবের দস্তমুবারকে

দ্বীনের পথে
জীবনের পথে
পথ চলায় যাঁর ছায়া, নির্দেশনা ও
রাহনুমায়ী সবসময় আমাকে আগলে রাখে,

আল্লাহ! তাঁকে সুস্থতাপূর্ণ, দারায ও
বরকতময় হায়াত দান করুন! আমীন!

—অনুবাদক

www.banglakitab.weebly.com

www.islamfind.wordpress.com

অনুবাদকের আরয

রমযানুল মুবারক মানব জাতির জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে দেয়া এক অমূল্য উপহার। রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের অমূল্য সম্পদ, অমূল্য সওগাত এই মাসের বৈশিষ্ট্য। রোযা, তারাবীহ, ই'তিকাফ, তেলাওয়াত, দান-খয়রাত সহ সমূহ ইবাদতের বেহেশতী মৌসুম এই মাসে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, গুনাহ ও পাপ থেকে পরহেয করা সহ এই মুবারক মাসটির অপরাপর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ হকের প্রতি অবহেলা ও অযত্নের কারণে এই মাসটি থেকে উপকার ও কল্যাণ আহরণে আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বঞ্চিত থেকে যাই। নিঃসন্দেহে এটা বড়ই দুর্ভাগ্য ও বঞ্চনার বিষয়।

এজন্যই রমযানুল মুবারক থেকে উপকার ও ফায়েদা আহরণে আমাদের উচিত সর্বাত্মক মনোযোগী ও যত্নবান হওয়া, অনুভূতি ও চিন্তাকে জাগ্রত করা এবং ইবাদত ও আমলের ক্ষেত্রে নিরলসভাবে নিমগ্ন থাকা। রমযানুল মুবারকের এই অনন্য উপহার থেকে যথাযথভাবে উপকৃত হওয়ার জন্য মন ও মানসিকতার যে প্রস্তুতি দরকার তারই একটি প্রচেষ্টা বক্ষ্যমান এই 'রমযানুল মুবারকের সওগাত' গ্রন্থটি।

এ গ্রন্থে হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)এর ব্যাপক উপকারী ও সমৃদ্ধ ওয়াযের সংকলন 'তাসহীলুল মাওয়ায়িয' থেকে রমযান বিষয়ক তিনটি ওয়ায এবং বর্তমান সময়ে এলম-আমল ও চিন্তায় আকাবিরে দ্বীনের স্বার্থক উত্তরসূরী জাষ্টিস মাওলানা মুহাম্মদ তকী উসমানী সাহেবের তিনটি বক্তৃতার সমন্বিত সরল বঙ্গানুবাদ তুলে দেওয়া হয়েছে। হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহঃ) এবং জাষ্টিস মাওলানা তকী উসমানী সাহেবের রমযান বিষয়ক ওয়ায ও বক্তৃতার সমন্বয়ে গ্রন্থটি প্রকাশের পরিকল্পনা ও প্রেরণা ছিলো প্রকাশক লেখক বন্ধুবর মাওলানা হাবীবুর রাহমান খানের। সে হিসেবে দুই যুগের এই দুই বুযুর্গের প্রতিটি বাক্যের ভার ও ভাবের নিজস্বতা অক্ষুন্ন রাখার প্রতি সযত্ন থেকে তরজমার ক্ষেত্রে পুরোপুরিই মূলানুগ থাকার চেষ্টা করা হয়েছে। মুদ্রিত উর্দু ওয়ায ও বক্তৃতার মূলকপিতেই উপশিরোনামের উপস্থিতি ছিলো। কেবল গ্রন্থভুক্ত শেষের দুটি বক্তৃতায় কোন উপশিরোনাম

মূল উর্দুতে না থাকা সত্ত্বেও পাঠক সাধারণের সুবিধার্থে উপশিরোনাম লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যেই দু'জন মহান ব্যক্তিত্ব ও বুযুর্গের ওয়ায ও বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ এই গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে তাঁদের বক্তব্য ও রচনা অনুবাদের ক্ষেত্রে নিজের হক, উপযোগিতা ও মুনাসাবাতের কথা চিন্তা করলে তাঁদের বক্তব্য ভাষান্তরের দুঃসাহস অবশ্যই দীন অনুবাদকের হতো না। কেবল সাধারণ মুসলমানদের প্রতি রমযানুল মুবারক দ্বারা যথাযথ উপকার লাভের জন্য যে দরদ ও রাহনুমায়ী তাঁরা ব্যক্ত করেছেন, তা বাংলাভাষী মুসলমানদের মাঝেও অযোগ্য ও দুর্বল হাতে হলেও পৌঁছে দেওয়া দরকার—এই অনুভূতিটিই অনুবাদকর্মে হাত দেওয়ার সাহস যুগিয়েছে। প্রকাশক মাকতাবাতুল আশরাফের স্বত্বাধিকারী জনাব মাওলানা হাবীবুর রাহমান খান সাহেবেরও ছিলো এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ ও তাগাদা। ফলে 'রমযানুল মুবারকের সওগাত' নামের এই অনুবাদ-সংকলন গ্রন্থটি পাঠকবর্গের হাতে উঠে আসতে পেরেছে। অনুবাদ কর্মে কিংবা এই প্রচেষ্টায় কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে যাওয়া অবশ্যই অসম্ভব নয়। ভুল ধরিয়ে দেওয়াকে আমরা হীতাকাংক্ষাই মনে করবো।

পরিশেষে এই গ্রন্থটির সমাপ্তি ঘটায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি এবং মুনাজাত করছি—আল্লাহ যেন আমাদের প্রত্যেককেই রমযানুল মুবারক দ্বারা ভরপুর উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করেন এবং রমযানের বিশেষ সওগাত, রহমত, মাগফিরাত ও নাজাত হাসিলকারীদের মধ্যে আমাদেরকেও শামিল করে নেন। আমীন!

শরীফ মুহাম্মদ
১৬ই শা'বান ১৪২১ হিজরী

www.banglakitab.weebly.com

www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
রমযানের নিখাঁদ আয়োজন	
রোযার মাঝে মন্দ কাজ–কর্ম করা কেমন	১৭
রমযানে পালন করা ইবাদতের প্রভাব সারা বছর থাকে	১৯
মিথ্যা	২১
গীবত	২১
ভুল তাদের, যারা বলে হালাল রিযিক পাওয়া যায় না	২২
নফসের দুর্বল সাহসিকতার উত্তম চিকিৎসা	২৪
রিযিকের মধ্যে বরকতের অর্থ	২৫
এক ব্যক্তির মসজিদ বানানোর কাহিনী	২৫
আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ঃ সমগ্র পৃথিবীর সকল জিনিস থেকে হাজার গুণ উত্তম	২৫
আমাদের নামাযের অবস্থা	২৬
আমাদের যেমন নামায ঃ তারজন্য শাস্তি না হওয়াই বড় রহমত	২৭
তারাবীহর মাঝে যেসব অসিদ্ধতা চালু আছে, তার আলোচনা	২৯
শবীনার মাঝে বিরাজমান দোষ–অসিদ্ধতার আলোচনা	৩০
পরমহিলাকে তারাবীহর মাঝে কুরআন শরীফ শুনানো মন্দ থেকে মুক্ত নয়	৩২
মুর্দার কবরে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কুরআন শরীফ পড়ানো হারাম	৩৩
এক তালেবে এলমের ঘটনা	৩৪
হাফেযদের নিয়ত নষ্ট হলো কিভাবে, কি কারণে ইবাদতের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ শুরু হলো	৩৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
খতমের দিন অধিক বাতি জ্বালানোর মাঝে কী কী অসিদ্ধতা	৩৬
দ্বীনের সৌন্দর্য দ্বীনের দ্বারাই, হযরত উমর (রাদিঃ)এর ঘটনা	৩৭
অপব্যয় কাকে বলে	৩৮
খতমের দিনে মিষ্টি বিতরণে কী কী অসিদ্ধতা ও দোষ থাকে	৩৯
মসজিদ পাকা বানানো ভালো, সাজসজ্জা করা সঙ্গত নয়	৪০
খতমের মিষ্টির ক্ষেত্রে নিয়তের অসিদ্ধতার আলামত	৪০
ঈদের রাতে রোযার নিয়্যতে না খাওয়া বিদআত	৪১
ঈদের দিনে অপরিহার্য মনে করে সেমাই পাকানো বিদ'আত	৪২
রুসম করে হাদিয়া দেওয়ার দ্বারা আন্তরিকতা বাড়ে না, মনোবেদনা জাগে	৪৩
ঈদের দিনে পাঠানো হাদিয়া মূলত ঋণস্বরূপ দেওয়া হয়ে থাকে	৪৪
গোটা ওয়াযের নির্যাস	৪৪

শেষ দশদিনের আহকাম

রমযান শরীফের দশদিনের মহত্ব	৪৬
জুমার দিনের মর্যাদার প্রতি আপত্তি এবং তার জবাব	৪৮
মায়ের সাথে সহবাস করার স্বপ্ন এবং তার তা'বীর	৪৯
জাহেল মানুষের কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করবেন না	৪৯
কুরআন শরীফের মর্যাদার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, উহা আল্লাহ্ পাকের কালাম	৫০
কুরআন শরীফ পড়ার দ্বারা আল্লাহ পাক যতটুকু সন্তুষ্ট হন, অন্য কিছু পড়ার দ্বারা ততটুকু হন না	৫০

বিষয়	পৃষ্ঠা
কুরআন শরীফ অর্থ না বুঝে পড়ার বিষয়ে আধুনিক চিন্তার মানুষের প্রশ্ন এবং তার জবাব	৫১
নফসের এছলাহের সময় মাখলুকের দিকে একদম মনোযোগ দিতে নেই এবং এরই একটি আশ্চর্য কাহিনী	৫২
কামেল পীর মুরীদকে নিরাশ করে না বরং তার চিকিৎসা করে	৫৩
আল্লাহ্ পাকের মহব্বত সব মহব্বতের উপর প্রবল হওয়া চাই	৫৩
লোকজন কুরআন শরীফের সাহায্যে দুনিয়া কামানো শুরু করেছে	৫৪
কুরআন শরীফ যতবাই পড়ুন প্রতিবারই নতুন স্বাদ পাবেন	৫৪
সাধারণ মানুষের এই ধারণা ভুল যে, যখন স্বাদ লাগবে, তখনই কুরআন শরীফ পড়বো এবং এ বিষয়ে উত্তম উদাহরণ	৫৫
এক বুযুর্গের আল্লাহকে তলব করার কাহিনী	৫৬
সেই ব্যক্তিই অন্বেষণকারী, সাক্ষাতের ব্যাপারে যে নিরাশ হয় না এবং আশ্চর্য একটি কাহিনী	৫৬
আল্লাহর পথে যে ব্যক্তি চলতে চায় তার জরুরী কর্মসূচী	৫৭
কোমলতা যেমন চিকিৎসা তেমনই কঠোরতাও চিকিৎসা	৫৮
শবে কদরের বরকত হাসিল করার তাকীদ	৬০
যে ব্যক্তি সারাবছর রাতে ইবাদত করবে সে অবশ্যই শবে কদর পাবে এবং এ বিষয়ক একটি আশ্চর্য কাহিনী	৬২
ইতিকাফের ফযীলত	৬৩
বৃদ্ধ পিতার খেদমত করা অত্যন্ত জরুরী	৬৩
অধিকাংশ মানুষ মাতাপিতার খেদমত থেকে অনাগ্রহী হয়ে যায়, কারণ তারা নিজেদের শৈশব ভুলে যায় এবং একটি কাহিনী	৬৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
রমযান শরীফের ফযীলত	৬৬
জাহেল ওয়ায়েযদের মারাত্মক গলদ	৬৭
অন্যায় নগরের অদ্ভূৎ কাহিনী	৬৭
ভবিষ্যতে গুনাহ হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকলেও তওবা ছাড়বেন না এবং একটি নেহায়েত সুন্দর উদাহরণ	৭০
কুরআন শরীফ শুনানোর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ না করা উচিত	৭০
কুরআন শরীফ খতমের সময় মিষ্টি বিতরণে বহু অসিদ্ধতা বিদ্যমান	৭১

রোযা এবং ঈদের পরিপূর্ণতা

রমযানের শেষ জুমায় খুৎবাতুল বিদা পড়া বির্দ'আত	৭৬
ঈদগাহে শিশুদের নিয়ে যাওয়া এবং তার অসিদ্ধতা	৭৬
জামাতের হেকমতসমূহ	৭৭
হুকুম–আহকামের মাছলেহাত বা কল্যাণময় কারণ উপলব্ধি করা যে কোন ব্যক্তির কাজ নয়	৭৮
গ্রামে জুমা ছহীহ হওয়া না হওয়া এবং বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি অত্যন্ত সুন্দর জবাব	৭৮
আলাভোলা হওয়া কোন বড় কামাল বা মর্যাদাকর বিষয় নয়	৭৯
সালেক মাজযূবের তুলনায় আকলের কারণেই উত্তম	৭৯
হযরত রাবেয়া বসরীয়া (রহঃ)এর কাহিনী	৮০
একটি গ্রামে শাস্তি অবতরণের কারণ এবং গুনাহগারদের প্রতি গোস্বা না করার কারণে এক আবেদকে আযাবে শামিল করার ঘটনা	৮১

বিষয়	পৃষ্ঠা
নাজায়েয কাজের প্রতি আল্লাহ–প্রেমিকদের গোস্বা আসা অপরিহার্য এবং তার উদাহরণ	৮১
হযরত তালহা (রাদিঃ)এর আত্মমর্যাদা বা গায়রতের ঘটনা	৮৩
হযরত সওবান (রাদিঃ)এর ঘটনা	৮৪
গায়রাত বা আত্মমর্যাদাবোধের দাবী হলো প্রেমাস্পদ ভিন্ন ব্যক্তি–বস্তুকে মিটিয়ে দেওয়া	৮৫
আকল বা জ্ঞান–বুদ্ধির বিচারে মানুষ চার প্রকার	৮৫
হযরত উমর (রাদিঃ)এর ইনসাফের ঘটনা	৮৮
হযরত মাওলানা গাঙ্গুহী (রহঃ)এর গরীব–মিসকীনদের প্রতি মহব্বত পোষণের কাহিনী	৮৯
আল্লাহর অন্বেষণকারীর ধৈর্যশীল ও সহনশীল হওয়া অপরিহার্য	৯১
রমযানের প্রথম অংশ রহমত মাঝের অংশ ক্ষমা, শেষ অংশ দোযখ থেকে নাজাত	৯১
তাওফীক ব্যতীত কোন নেক আমলই হয় না	৯২
দুআর মাঝে এই শর্ত না লাগানো চাই যে, আল্লাহ ! আপনি যদি চান তাহলে কবুল করুন	৯৪
প্রতিটি আমলের সৌন্দর্য তখনই হাসিল হবে যখন আমলটি তার তরীকা অনুযায়ী করা হবে	৯৫
শাহ আবুল মাআলী এবং শাহভীক সাহেব (রহঃ)এর ঘটনা	৯৮
রমযানে উদাসীন থাকার ক্ষেত্রে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে মানুষকে ভীতি প্রদর্শন ও সতর্কীকরণ	৯৯
মৌরুসী বা উত্তরাধিকারের সম্পদ আটকে রাখা হারাম	১০১
দ্বিতীয় বিষয় ঈদ সম্পর্কে	১০২

বিষয়	পৃষ্ঠা
ঈদের রাতে একদম না খাওয়ার ভিত্তি	১০২
ঈদের দিনে আমাদের ওপর খুশী উদযাপনের হুকুম বিদ্যমান	১০৩
এক বুযুর্গের কুকুরী বাচ্চা জন্ম নেওয়ায় দুনিয়াদারদেরকে দাওয়াত করা এবং এক বুযুর্গকে দাওয়াত না করা	১০৪

রোযা আমাদের কাছে কী দাবী করে?

বরকতপূর্ণ মাস	১১১
ফেরেশতাগণ কি যথেষ্ট ছিলেন না	১১২
ফেরেশতাগণের কোন কামাল বা অর্জিত যোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব নেই	১১৩
অন্ধের দৃষ্টি সংযমে কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই	১১৪
এই ইবাদত ফেরেশতাগণের ক্ষমতাভুক্ত নয়	১১৪
হযরত ইউসুফ (আঃ)এর কামাল বা শ্রেষ্ঠত্ব	১১৫
আমাদের জান–প্রাণ বিক্রি হয়ে গেছে	১১৬
এমন ক্রেতার জন্য উৎসর্গীত হয়ে যান	১১৭
এই মাসে আসল উদ্দেশ্যের দিকে ফিরে এসো	১১৭
রমযানের অর্থ	১১৮
নিজের গুনাহসমূহ ক্ষমা করিয়ে নিন	১১৮
এই মাসকে মুক্ত করে নিন	১১৯
রমযানকে স্বাগত জানানোর সঠিক পন্থা	১২০
রোযা ও তারাবীহ থেকে এক কদম সামনে	১২১
একটি মাস এইভাবে কাটিয়ে দিন	১২১
এ কেমন রোযা?	১২২
রোযার সওয়াব ধূলায় মিশে গেছে	১২৩
রোযার উদ্দেশ্য তাকওয়ার প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করা	১২৩
রোযা তাকওয়ার সিঁড়ি	১২৪

বিষয়	পৃষ্ঠা

আমার মালিক আমাকে দেখছেন	১২৫
আমিই তার প্রতিদান দেবো	১২৫
অন্যথায় এই প্রশিক্ষণ কোর্স পূর্ণাঙ্গ হবে না	১২৬
রোযার এয়ারকণ্ডিশন তো লাগিয়ে দিলেন, কিন্তু?	১২৭
মূল লক্ষ্য হুকুমের আনুগত্য	১২৭
আমার হুকুম লংঘন করেছে	১২৮
ইফতারে জলদি করুন	১২৯
সাহরীতে বিলম্ব করা উত্তম	১২৯
একটি মাস গুনাহ ব্যতীত অতিবাহিত করে নিন	১৩০
এই মাসে হালাল রিযিক	১৩০
হারাম আয় থেকে বাঁচুন	১৩১
আয়ের পদ্ধতি যদি সম্পূর্ণই হারাম হয়ে থাকে তবে?	১৩১
গুনাহ থেকে বাঁচা সহজ	১৩২
রোযার মাঝে ক্রোধ থেকে সংযত থাকা	১৩২
রমযানে নফল ইবাদত বেশী করবেন	১৩৩

কুরআন নাযিল হওয়ার মাস

রমযানের অনন্য বৈশিষ্ট্য ঃ কুরআনের অবতরণ	১৩৪
লওহে মাহফুয থেকে বাইতুল মা'মূর ঃ সেখান থেকে	১৩৫
লাইলাতুল কদর ঃ কী এবং কখন?	১৩৬
শবে কদর উদযাপন ঃ সর্বোত্তম পন্থা কোন্‌টি?	১৩৮

দুআ কবুলের মাস

বিশেষ সময় ঃ বিশেষ রহমত	১৪০
বেশী বেশী দুআ ঃ সর্বোত্তম পন্থা	১৪১
হাদীসসমূহে দুআ কবুলের বর্ণনা	১৪১
দুআর বিশেষ মুহূর্ত	১৪২

www.banglakitab.weebly.com

www.islamfind.wordpress.com

বিষয়	পৃষ্ঠা

দুআ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য তিনটি বিষয় ১৪৩
দুআ নিষ্ফল হয় না ১৪৪

রমযানের উপহার ও যাকাতের মাসায়েল

রমযান মাস ঃ গুরুত্ব ও ফযীলত ১৪৭
রোযা ১৪৮
রোযার নিয়ত ১৫২
যেসব কারণে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায় ১৫৩
যেসব কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না মাকরূহ হয় ১৫৫
যেসব কারণে রোযা না রাখার অনুমতি আছে ১৫৮
সেহরী ১৫৯
ইফতার ১৬০
তারাবীহ ১৬১
শবে কদর ১৬২
ঈদের রাতের ফযীলত ১৬৩
এতেকাফ ১৬৩
রোযার কাযা ১৬৪
রোযার কাফ্ফারা ১৬৫
রোযার ফিদইয়া ১৬৬
সদকায়ে ফেতরের মাসায়েল ১৬৬
ঈদুল ফিতর ১৬৯
ঈদের দিনের ১৩টি সুন্নত ১৭০
ঈদের নামাযের নিয়ত ১৭১
ঈদের নামায পড়ার নিয়ম ১৭২
যাকাত ১৭৩

॥ ॥ ॥

হাকীমুল উম্মত
হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)

* রমযানের নিখাঁদ আয়োজন

* শেষ দশদিনের আহকাম

* রোযা এবং ঈদের পরিপূর্ণতা

www.banglakitab.weebly.com
সূচীপত্র
www.islamfind.wordpress.com

রমযানের নিখাঁদ আয়োজন

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نومن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئت اعمالنا من يهد ه الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادى له و نشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له و نشهدان سيدنا و مولنا محمدا عبده و رسوله صلى الله تعالى عليه و على اله واصحابه و بارك و سلم –

রমযান শরীফের সময় যেহেতু নিকটবর্তী হয়ে গেছে তাই সঙ্গত হলো তার কিছু বিধি–বিধান আলোচনা করা। একথা তো সকলেরই জানা রয়েছে যে, রোযা রাখা ফরয ; সে আলোচনার তাই প্রয়োজন নেই। একইভাবে তারাবীহ সম্পর্কেও সবাই জানেন যে, তা জরুরী ; সে আলোচনাও নিষ্প্রয়োজন।

রোযার মাঝে মন্দ কাজ–কর্ম করা কেমন

অবশ্য এই আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে যে, কতিপয় লোক এই মাসে কিছু মন্দকাজ, খারাপ কাজ সংযোজন করে রেখেছে। তার কারণ হলো এই যে, সেইসব লোকের হয় বিলকুল কোন এলম নেই অথবা এলম আছে তবে কম, কিংবা জানে ঠিকই কিন্তু সতর্কতা অবলম্বন করে না। বড়ই আশ্চর্যের কথা, এ মাসটাতেও তারা মন্দকাজ থেকে বিরত থাকে না। তারা ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ তাআলা এই মাসে সেইসব বস্তুকেও হারাম করে দিয়েছেন, যা পূর্বে হালাল ছিলো,

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

অতএব যে সব বস্তু পূর্ব থেকেই হারাম ছিলো, সেগুলো কী পরিমাণ অধিক হারাম হয়ে থাকতে পারে। আল্লাহ তাআলা রোযা রাখার কারণ এটা বলেছেন যে, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ রোযা এজন্য যে, তোমরা পরহেযগার হয়ে যাও। এখন প্রত্যেক ব্যক্তি-ই ভেবে দেখুক! রমযানে রমযানপূর্ব সময় থেকে সে কতটুকু অধিক পরহেযগার হয়েছে, তার পূর্ব-অবস্থা এবং বর্তমান অবস্থার মাঝে কতটুকু ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে, কুদৃষ্টি সে ত্যাগ করেছে কিনা, গীবত করা থেকে অর্থাৎ কারো আড়ালে মন্দকিছু বলা থেকে বিরত হয়েছে কিনা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কোন বস্তুই ত্যাগ করেনি, উভয় অবস্থাই অভিন্ন রয়েছে, কোন ক্ষেত্রেই কোন হ্রাস ঘটেনি। শুধু একটি কাজ এই করেছে যে, খানা খাওয়ার সময় বদলে দিয়েছে। খাওয়ার পরিমাণেও কোন হ্রাস ঘটায়নি। যতটুকু খানা আগে খেত, ততটুকু খানা রমযানেও খাচ্ছে।

মোটকথা আল্লাহ তাআলা রোযা আমাদের উপর এজন্য ফরয করেছেন, যেন মন্দ কাজ-কর্ম কমে যায়। কিন্তু লোকজন কোন কিছুই কমায়নি। অথচ আল্লাহওয়ালাগণ পূর্বের মাসগুলোর তুলনায় এই মাসে খানাও কম খেয়ে থাকেন এবং কেউ কেউ তো শুধু এতটুকুই খেয়ে থাকেন যে, জীবনটা কোনভাবে টিকে থাকে ; এরচেয়ে বেশী তাঁরা খান না। তাঁরা চিন্তা করেছেন, সবসময় ভালো খাবার-দাবার খেয়েছি। এই একটি মাস ইবাদতের উদ্দেশ্যেই কেটে যাক। এ কারণেই তাঁরা কিছু হাসিলও করে ফেলেছেন। মোটকথা তাঁরা খাবারেও হ্রাস ঘটিয়েছেন। অবশ্য খানা কম খাওয়ার এই ব্যাপারটি কোন অপরিহার্য বিষয় নয়, এটি একটি সওয়াবের কাজ। এই কাজটি এমন ব্যক্তিই করতে সক্ষম হয়ে থাকেন, যিনি অত্যন্ত দ্বীনদার। সবার দ্বারা এই ব্যাপারটি ঘটা সম্ভব নয়। কিন্তু গুনাহটা ছেড়ে দিন। ঠিক আছে, খাবার যদি পূর্বের সময়ের সমপরিমাণই খান, তবে তা জায়েয আছে। কিন্তু গুনাহ তো কোনভাবেই জায়েয নেই। অথচ আমাদের অবস্থা এমন যে, আমরা দিনভর গুনাহ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে থাকি। বরং কেউ কেউ তো রমযানে আরো অধিক গুনাহ করতে শুরু করে। এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করুন যে, ফজরের নামায এই মাসে যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হয় কিনা। দেখা যাবে কোথাও সেটা হচ্ছে

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

না। এই নামাযটিকে সময়ের চেয়ে বিলম্ব করে পড়ার অভ্যাস হয়ে গেছে ; অনেকেরই কাযা হয়ে যায়। আর কাযা না হলেও এতটুকু বিলম্ব অবশ্যই হয়ে যায়, যার ফলে নামাযের জামাত ছুটে যায়। তারা প্রফুল্ল থাকে এই ভেবে যে, আমরা রোযা রেখে ফেলেছি। আশ্চর্যের কথা হলো, তারা নামায ছেড়ে দিয়েছে। বলুন তো! শুধু রোযা কিভাবে তারজন্য যথেষ্ট হতে পারে?

আল্লাহ তাআলা আপন দয়া ও অনুগ্রহ এ পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছেন যে, দশগুণ সওয়াব বৃদ্ধি করার ওয়াদা ঘোষণা করেছেন। আর আমরা এ পরিমাণ গুনাহ করে থাকি যে, নেকী ও সওয়াবকে দশগুণ বৃদ্ধি করে দেওয়া সত্ত্বেও আমাদের গুনাহ-ই থেকে যায় বেশী। উচিত তো ছিলো নেকী বাড়তে থাকা। এটাও না হয় ছেড়ে দিন, অন্ততঃ সমান-সমান থাকা তো উচিত। কেননা আল্লাহ তাআলার নিকট নেকীকেই অধিক গণনা করা হয়। সেটার কারণ হলো তাঁর মেহেরবানী তাঁর ক্রোধ ও রাগের চেয়ে অনেক অগ্রসর। তাই যখন মন্দ আর ভালো দুটাই সমান-সমান হবে, তখনও রহমত বেশী হওয়ার কারণে তিনি ভালো কাজগুলোর প্রতি-ই নযর করবেন। আর যখন আমাদের পরিস্থিতি এমন যে, নেকীসমূহকে তিনি দশগুণে পরিণত করা সত্ত্বেও আমাদের গুনাহ-ই বেড়ে চলেছে তখন আমাদের অবস্থা সেদিন কেমন হওয়া বাঞ্ছনীয়? ঠিক আছে, এটাও না হয় ছেড়ে দিন ; সবসময় গুনাহসমূহে কোন হ্রাস ঘটাতে যদি আমরা না-ও পারি, অন্তত রমযানে তো তেমন করে নেওয়া উচিত।

রমযানে পালন করা ইবাদতের প্রভাব সারা বছর থাকে

অভিজ্ঞতা দ্বারা জানা গেছে যে, কোন ইবাদতের প্রভাব ও ক্রিয়া সেই ইবাদত পালন করার পর এগার মাস পর্যন্ত বজায় থাকে। যে ব্যক্তি তবীয়তের ওপর চাপ সৃষ্টি করে হলেও রমযানে নেকীর কাজ করে, পরবর্তী সময়ে সে নেকীর কাজ সহজভাবে করতে সক্ষম হয় এবং যে ব্যক্তি রমযানে কোন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, সারা বছর সহজভাবেই

সেই গুনাহ থেকে সে বাঁচতে পারে। আর এই মাসে গুনাহ বর্জন করা কোন দুরূহ কাজ নয়। কেননা হাদীস শরীফে আছে, শয়তানকে আবদ্ধ করে রাখা হয়। সুতরাং শয়তান যখন আবদ্ধ হয়ে গেলো তখন গুনাহ এমনিতেই কমে যাবে এবং গুনাহর কাজ–কর্ম ছেড়ে দেওয়া সহজ হয়ে যাবে। কারণ গুনাহর প্রতি উৎসাহ দানকারী বস্তু হচ্ছে দুটি। একটি হচ্ছে শয়তান, অপরটি নফস। অতএব শয়তানকে যখন কয়েদ করে ফেলা হয়েছে, তখন গুনাহর প্রতি উৎসাহ দানকারী একটি মাত্র বস্তু নফসই অবশিষ্ট থাকলো। সে হিসাবে একটিকে প্রতিরোধ করা সহজ। পূর্বের সময়ের মত উভয় বস্তুকে প্রতিরোধ করার কষ্ট রমযানে করতে হয় না। এই একটি মাসে এই কষ্ট স্বীকার করা কোন মারাত্মক কঠিন ব্যাপার নয়। এই একমাসে যখন গুনাহ ত্যাগ করে চলবেন তখন গোটা বছর গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা আপন থেকেই সহজ হয়ে যাবে। সারকথা হলো, এই মাসে প্রতিটি অঙ্গকেই গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন।

মিথ্যা

এক জিহ্বার গুনাহই বিশটি ; ইমাম গাযালী (রহঃ) যেমন লিখেছেন। সেসবের মধ্য হতে মিথ্যাও একটি গুনাহ ; যে গুনাহকে লোকেরা বানিয়ে রেখেছে এমন, যেমন মায়ের দুধ, তা থেকে কেউ বাঁচতে পারে না। মিথ্যা এমনই বিষয়, যা কারো নিকটই বৈধ নয়। এতদসত্ত্বেও মুসলমান এই মিথ্যাকে কিভাবে মজাদার মনে করে? অথচ মিথ্যার সাথে সামান্য পরিমাণ সম্পৃক্ত হলেও গুনাহ হয়ে যায়। এমনকি এক সাহাবিয়া (রাদিঃ) যখন একটি শিশুকে তুষ্ট করার জন্য এইকথা বললেন যে, এখানে এসো! তোমাকে বিভিন্ন জিনিস দেবো, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, যদি সে চলে আসে তখন কী জিনিস তুমি তাকে দিবে? সাহাবিয়া (রাদিঃ) দেখিয়ে বললেন এই যে, খেজুর রয়েছে আমার হাতে। তিনি এরশাদ করলেন—যদি কোন কিছু দেওয়ার নিয়ত তোমার না থাকতো, তাহলে এই কথাটাকে গুনাহ হিসাবে লেখা হতো। আপনারা দেখলেন—মিথ্যা এমনই খারাপ জিনিস। যাই হোক—এটা তো বড় ও উঁচু স্তরের মানুষের

ঘটনা। যদি এ থেকে বাঁচতে নাও পারেন, তাহলে যা খোলাখুলি মিথ্যা, তা থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকা উচিত এবং বিশেষত রোযার মাঝে।

গীবত

জিহ্বার দ্বিতীয় গুনাহ হলো এই যে, কোন লোকের আড়ালে–অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন কথা বলা, যে কথায় সে অসন্তুষ্ট হয় ; এটাকে গীবত বলে। লোকজন বলে থাকে যে, ভাই! আমি তো কথাটা তার মুখের ওপর বলে দিতে পারবো। আরে ভাই! মুখের ওপর দোষ–ত্রুটি ধরলেই ভালো কি আর করলেন? অবশ্য এটা ঠিক যে, মুখের ওপর দোষ–ত্রুটি ধরলে বদলাও পেয়ে যাবেন। সেই ব্যক্তি আপনাকে কোন খারাপ কথা বলে দিবে অথবা নিজের মধ্যের সেই দাগ মুছে ফেলবে। আড়ালে মন্দ কথা বলা তো শূন্যের মধ্যে আঘাত করার নামান্তর। মনে রাখবেন, অপরের মালের মূল্য ও সম্মান যেমন, তেমনি শুধু নয়, তার চেয়েও অধিক সম্মান হলো তার ইয্যতের। লক্ষ্য করে দেখুন, ইয্যতের ওপর যখন আঘাত আসে, তখন ধনসম্পদ আর কী জিনিস––জানের পর্যন্ত পরোয়া থাকে না। অতএব অপরের ধনসম্পদের উপরই যখন হস্তক্ষেপ করা জায়েয নেই, তখন তার ইয্যত–আব্রুর উপর হস্তক্ষেপ করা কিভাবে জায়েয হতে পারে? কিন্তু গীবত বর্তমানে এতই ব্যাপক হয়ে গেছে যে, জানাও থাকে না কথাবার্তার মাঝে কোন গীবত হয়ে গেলো কিনা। এ থেকে বাঁচার উপায় শুধু এটাই যে, কারো ভালো কিংবা মন্দ কিছুই না বলা। কেননা যদি কারো গুণাবলীও বর্ণনা করতে থাকেন, শয়তান অন্যজনের দোষ বর্ণনা পর্যন্ত পৌঁছে দিবে। বর্ণনাকারী ভাবছে আমি তো গুণাবলী আলোচনা করছি, অথচ অপরের দোষ ও মন্দ আলোচনার মিশ্রণ ঘটে যাওয়ায় সেই গুণাবলীর আলোচনাও, ভালোর বর্ণনাও ইচ্ছা–অনিচ্ছায় মন্দ বর্ণনার সমান হয়ে গেলো। আরে ভাই! আপনার জন্য তো আপনার কাজই অগ্রাধিকারযোগ্য, প্রথমে সেটাই করুন। অন্যের পিছনে যাওয়ার আপনার কী দরকার। তাছাড়া গীবতের মাঝে গুনাহ হওয়া ছাড়া অন্য কোন মজাও তো নেই ; উপরন্তু দুনিয়াতেও রয়েছে ক্ষতি। কারণ, যখন

অপর ব্যক্তি গীবত করার কথা শুনবে, তখন শত্রুতার সৃষ্টি হবে। এরপর আপনি নিজেই বুঝে নিন—এর কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে? এভাবেই জিহ্বার বহু গুনাহ রয়েছে। সবগুলো থেকেই বেঁচে থাকা জরুরী। রোযার সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত আরেকটি গুনাহ রয়েছে। সেটি হলো, হারাম মাল দ্বারা রোযার ইফতার করা। বড়ই আশ্চর্যের কথা ! ভেবে দেখুন—এই মাসে যেখানে হালাল খানাও একটি সময়ে হারাম হয়ে গেছে, সেখানে এটা কোন্ বুদ্ধি-বিবেচনার কথা যে, দিনভর মানুষ যেই হারামকে বর্জন করে চলছে, সন্ধ্যায় সেই হারাম দ্বারাই ইফতার করছে।

ভুল তাদের, যারা বলে হালাল রিযিক পাওয়া যায় না

আসল কথা হলো, কিছু কিছু লোক তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে। তারা বলছে, হালাল রিযিক তো নদীতে মাছ শিকার করে খাওয়া অথবা তরিতরকারী কিংবা ময়দান থেকে ঘাস খাওয়া ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। তারা এ ব্যাপারে কিছু গল্পও মশহুর করে দিয়েছে। তারা এক বুযুর্গের এই গল্পটি বর্ণনা করে থাকে যে, বুযুর্গের একটি ষাড় লড়াই করতে করতে অন্যের ক্ষেতে চলে গিয়েছিলো। ফলে তিনি তার ক্ষেতের ফসল খাওয়া এ চিন্তা করে ছেড়ে দিয়েছেন যে, জানা নেই অন্যের ক্ষেতের যেই মাটি আমার ষাড়ের খুঁরে লেগে বিনা অনুমতিতে চলে এসেছে, তা কোন্ দানার সাথে মিশে গেছে? যদি এই গল্পটি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে এটা ছিলো সেই বুযুর্গের বিশেষ অবস্থা। এ কারণে তিনি মজবুর বা অপারগ ছিলেন। অন্যদের ওপর এমন করা জরুরী নয়। আর যদি নিজের ইচ্ছা ও ইখতিয়ার থেকে তিনি এমন করে থাকেন তাহলে এটাকে ধরে নিতে হবে তাকওয়ার বিশেষ প্রেরণা হিসাবে, যেখানে এতটুকু সন্দেহকেও হারামের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়ে থাকে। এটা স্পষ্ট যে, এসব থেকে বেঁচে চলা মুশকিল। এ থেকে এই সংশয় ও ধারণার জন্ম হতে পারে যে, আসলে হারাম থেকে বাঁচাই মুশকিল। উপরন্তু একথাও বলে ফেলতে হয় যে, প্রতিটি মানুষই হারামের মাঝে বাঁধা পড়ে আছে এবং হালালকে সম্পূর্ণ বর্জন করে রেখেছে। আমি

জিজ্ঞাসা করছি—সকল মৌলবী সাহেবরা কি হারাম খাচ্ছেন?

এক বুযুর্গ ছিলেন। নাম মাওলানা মুযাফফর হোসাইন সাহেব (রহঃ)। তাঁর অবস্থা এমন ছিলো যে, কেউ যদি ধোকা দিয়েও তাঁকে হারাম সম্পদ খাইয়ে দিতেন, তাহলে তাঁর বমি হয়ে যেত। অথচ তিনি তো দুইবেলাই খানা খেতেন। এর দ্বারা পরিষ্কার বুঝে আসে যে, হালালও দুনিয়াতে অবশ্যই আছে, তা নাহলে তিনি কী খেতেন? যদি হারাম মালই তিনি খেতেন, তাহলে হারামের প্রতি তাঁর তবীয়তের এই পরিমাণ বিতৃষ্ণা বজায় থাকা সম্ভব হতো না। বরং বলতে হয় যে, সব সময়ই তাঁকে বমি করতে হতো। অতএব হালাল রিযিক না পাওয়ার এই দাবিটা স্পষ্টতই ভুল ও ত্রুটিপূর্ণ। প্রকৃত কথা হলো, দুনিয়ায় হালালও রয়েছে, হারামও রয়েছে। যদি লোকজন মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে থাকে, তাহলে কিন্তু সব জানা হয়ে যায়। অথচ লোকজন জিজ্ঞাসাই তো করে না। লোকজনের এই জিজ্ঞাসা করা ছেড়ে দেওয়া থেকেই সমস্ত বিপর্যয় সৃষ্টি। মনে যা আসে, তাই করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সেটাই তাদের অভ্যাস হয়ে যায়। এরপর কেউ যখন হারাম বস্তু থেকে নিষেধ করে তখন তা ছেড়ে দেওয়া নেহায়েত মুশকিল মনে হয়। তখন বলে ফেলে, আরে মিয়া! এইসব লোকেরা খামাখাই হালালকে হারাম বলে থাকে। তাদের উদ্দেশ্য এটাই যে, ধনসম্পদ না বৃদ্ধি পাক এবং মুসলমানরা বিত্তবান না হোক। এভাবে চলতে চলতে অবশেষে মস্তিষ্কে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, তাদের কাছে সব জিনিসই হারাম, হালাল কোন জিনিসই নেই। আর এ কারণে তারা হালাল বস্তুসমূহকেও হারাম মনে করতে শুরু করেছে এবং ভয়ে মৌলবী সাহেবদের কাছে গিয়ে এই কথা বলাও ছেড়ে দিয়েছে যে, দেখে-শুনে আমাদের মুআমালার মাঝে কোথায় হারাম রয়েছে, বলে দিন। তারা ধারণা করে নিয়েছে, কোন মুআমালাকে যদি তারা হালালও বলে দেন, তাহলে সেটা তারা বলবেন আমাদের খাতিরে, আসলে সেটা হারামই হবে। কারণ, হালালের তো পাত্তাই নেই। যাইহোক, এই ধারণাটি ভুল ধারণা। মৌলবী সাহেবগণ যে বিষয়টাকে হালাল বলবেন, সেটা আল্লাহর কাছে হালাল এবং যে বিষয়টাকে হারাম বলবেন, সেটা আল্লাহর কাছে হারাম। শয়তানের বহু জাল ও ফাঁদ

রয়েছে। সেসবের মধ্য থেকে এটিও একটি যে, সে মনের মধ্যে ওয়াসওয়াসা (সংশয় ও কুমন্ত্রণা) সৃষ্টি করে থাকে যে, এইসব কিছুই হারাম। অতঃপর কিছু কিছু লোক হারাম–হালালের মধ্যে খামাখা সন্দেহ করে হালালকেও এই ভেবে ছেড়ে দেয় যে, যখন এর মাঝে সন্দেহ হচ্ছে, তখন এটিকে ছেড়েই দাও, মৌলবী সাহেব যতই তাকে হালাল বলুক। ভেবে দেখুন! মৌলবী সাহেব তো কোন যালেম লোক নন যে, নাজায়েযকে জায়েয বলে দিয়ে খামাখা আপনাদেরকে গুনাহর মাঝে লিপ্ত করে দিবেন। যে জিনিসটি জায়েয হবে, তারা তো সেইটাকে আপনাদের কাছে জায়েয বলবেন। আর এটা ভাববেন না যে, হালালের অস্তিত্বই নেই। মৌলবী সাহেবদেরকে জিজ্ঞাসা করতে থাকুন তারা যে জিনিসের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন, সেটাকে সাহস ও মনোবলের সাথে ছেড়ে দিয়ে চলুন।

নফসের দুর্বল সাহসিকতার উত্তম চিকিৎসা

নফসের মনোবল ও সাহসিকতা যদি দুর্বল হয় তাহলে তাকে একথা বুঝান যে, দুনিয়ার বাদশাহদের আনুগত্য তো তুমি ঠিকই করছ, তাহলে যিনি সবচেয়ে বড় বাদশাহ, তার আনুগত্য করবে না কেন? তার নির্দেশ অবশ্যই মানা উচিত এবং যখন তুমি নিজেই নিজের সাহসিকতা মজবুত ও দৃঢ় করে নিবে তখন অন্যরাও তা থেকে তোমাকে ফেরাবে না। লোকে তো সবই মানে, মানুষ শুধু পাক্কা হওয়া চাই। তখন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এমন ব্যবস্থা করে দেন, যার দ্বারা তার হুকুম অনুযায়ী চলা সহজ হয়ে যায়। লক্ষ্য করুন, শাসক যখন কাউকে কোন কঠিন কাজের হুকুম দেয়, তখন নিজে তার সাহায্যও করে। মোটকথা হলো, অন্তর মজবুত করে নিন এবং পাক্কা এরাদা করুন যে, আমরা কোন কাজ জিজ্ঞাসা না করে করবো না। অবশ্য এই জিজ্ঞাসা করার কারণে কিছু কিছু বিষয় নাজায়েযও বের হয়ে আসবে, যার ফলে আয় কমে যাবে। কিন্তু এজন্য ঘাবড়াবেন না। কেননা এই কমের মধ্যেই বরকত হবে ; যখন চান, যাচাই করে নিন।

রিযিকের মধ্যে বরকতের অর্থ

এবং বরকত হওয়ার অর্থ এটা নয় যে, অল্প জিনিসই বেশী হয়ে যায়, বাজার থেকে নিয়ে আসবেন এক মণ আর ঘরে এনে রাখলেই তা হয়ে যাবে দু' মণ—এমন নয়। যদিও কখনো কখনো এমনটাও হয়ে থাকে।

এক ব্যক্তির মসজিদ বানানোর কাহিনী

এক দানশীল ব্যক্তি আমাকে বর্ণনা করলেন যে, তিনি একটি মসজিদ বানাচ্ছিলেন। একটি থলিতে টাকা জমা করে রাখছিলেন আর কাজ শুরু করিয়ে দিয়েছিলেন। যখন প্রয়োজন হতো, হাত দিয়ে সেই থলি থেকে টাকা বের করে নিতেন। শেষ পর্যন্ত সব কাজই সমাপ্ত হলো। হিসাব লাগানো হলো, যত টাকা থলিতে ছিলো, দেখা গেলো তার চেয়ে কিছুই কমেনি। কিন্তু এমন হয়ে থাকে খুব কমই। বরকতের এইরূপটাই অধিক হয়ে থাকে যে, আপনাদের যা কিছু আয় তার সবটুকুই আপনাদের কাজে লাগে, বাজে খরচ না হয়ে যায় এবং রোগ–ব্যাধি, অপব্যয়, ফালতু মামলা ও অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতার বস্তুতে ধ্বংস না হয়ে যায়। যা কিছুই আপনাদের আয় হয়, তা আপনাদের ওপরই ব্যয় হয়, এমন অল্প আয় সেই অধিক আয় থেকে উত্তম, যা আপনাদের ওপর ব্যয় হয় না।

আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ঃ
সমগ্র পৃথিবীর সকল জিনিস থেকে হাজার গুণ উত্তম

এবং শেষ পর্যায়ে আমি বলছি, বরকতের কথাও না হয় বাদ থাকুক স্বয়ং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি কি সামান্য কোন বিষয়? তার সামনে তো গোটা পৃথিবীর সকল জিনিসেরই কোন মূল্য নেই, কোন হাকীকত নেই। আরে ভাই, আল্লাহকে যদি পাওয়া যায়, তারপর কী মূল্য থাকে অন্য কোন জিনিসের? ধনসম্পদের তুলনায় কি আল্লাহ তাআলার কোন মর্যাদা ও ইযযত আছে বলে আপনারা মনে করেন না? দুনিয়ার বাদশাহদের সন্তুষ্টি লাভের জন্য কত পথ সফর করে থাকেন এবং কত

কিছু ব্যয় করতে হয়। তখন বাদশাহ সন্তুষ্ট হয় এবং সেই সন্তুষ্টিও সামান্য সময়ের জন্য। কেননা তুচ্ছ কারণেই সে রুষ্ট হয়ে যায়। অথচ আল্লাহ তাআলা এমনই মেহেরবান যে, তিনি বলেন—আমি শুকরিয়া আদায়কারী।' এই শব্দটার প্রতি সামান্য লক্ষ্য করুন। যদি কোন ব্যক্তি বাদশাহর সামনে কোন জিনিস নিয়ে যায় আর বাদশাহ সেই জিনিসটাকে মঞ্জুর করা না করার কিছুই প্রকাশ না করে ; অবশ্য তাতে কোন ত্রুটিও বের করে না, শুধু নিজের খাজাঞ্চিকে হুকুম দিয়ে দেয় যে, এটা রেখে দাও, তাহলে উক্ত জিনিস প্রদানকারীর মাথা আকাশে পৌঁছে যায় এবং সে মানুষকে শোনাতে থাকে যে, বাদশাহ আমাদের হাদিয়া গ্রহণ করে নিয়েছেন। অথচ আপনারা আল্লাহ তাআলার দিকে দেখুন, আমরা তাঁর কাছে আমাদের আমল নিয়ে যাই আর তিনি সেই আমলের কারণে শুকরিয়া আদায় করেন এবং তারীফ করেন। তারপর এটাও ভেবে দেখুন যে, আমাদের আমল কিসের উপযোগী? এক নামাযের কথাই ধরুন! দাঁড়াই তো আল্লাহ তাআলার সাথে কথা বলার জন্য, কিন্তু মনে মনে তামাম দুনিয়ার সাথে কথাবার্তায় লিপ্ত হয়ে যাই। কখনো থাকে এক জিনিসের ভাবনা, কখনো থাকে অন্য জিনিসের কল্পনা।

আমাদের নামাযের অবস্থা

আমাদের অবস্থা এমন যে, এক বাদশাহ শুধু নিজের মেহেরবানীবশত নিজের গোলামকে দরবারে আসার অনুমতি দিলেন। যখন গোলাম নিজে আসলো না, তখন তাকে ধরে আনার জন্য বাদশাহ লোক পাঠালেন। তারপর যখন ধৃত অবস্থায় সে দরবারে পৌঁছলো, তখন বাদশাহ তার প্রতি দয়া করলেন এবং আন্তরিকতা ও মহব্বতের সাথে কথাবার্তা বললেন, যেন সকল প্রজার মাঝে তার সম্মান ও মর্যাদা সৃষ্টি হয়। ঠিক আমাদের অবস্থাও এমনই যে, জোর করে, জবরদস্তির সাথে তিনি আমাদেরকে তাঁর দরবারে ডাকছেন শুধু আমাদের লাভ ও উপকারের জন্য, তার কোন লাভ নেই সেখানে।

এরপর গোলাম যখন দরবারে পৌঁছলো, তখন সে কী করলো? সেখানে পৌঁছেই মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়ালো এবং কানে আঙুল ঢুকিয়ে রাখলো।

কিন্তু বাদশাহ এমনই দয়ালু যে, তাতেও তিনি রাগান্বিত হলেন না, বরং খাদেমদের হুকুম দিলেন—'এই বেওকুফের আঙুলগুলো কান থেকে বের করে দাও, শুধু তাই নয়, হাতটাকেও বেঁধে ফেলো, যেন পুনরায় আঙুল কানে ঢুকাতে না পারে এবং তার মুখটাকে আমার দিকে ঘুরিয়ে দাও।' এরপর বাদশাহ দয়া ও কোমলতার সাথে দ্রুত কথাবার্তা বলতে লাগলেন, যেন কথাগুলো মুহূর্তের মধ্যেই তার কানে ঢুকে পড়ে। কিন্তু গোলাম তো কসম খেয়ে এসেছে বাদশাহর বিরুদ্ধাচরণ করবে। তাই সে চট করে আবার আঙুলগুলোকে কানের দিকে এগিয়ে নিলো। কিন্তু হাত বাঁধা ছিলো বলে সে অপারগ হয়ে গেলো। অবশ্য এই ভয় তার মাঝে বিরাজ করছিলো যে, কখন নাজানি প্রিয় বাদশাহর কথা আবার কানে এসে ঢুকে পড়ে। এজন্যই সেই জায়গা থেকে পালিয়ে সে ঘোড়া বাঁধার জায়গায় গিয়ে পৌঁছলো এবং সেখানে ঘোড়ার আড়ালে লুকিয়ে পড়লো। ধরার জন্য সেখানে যখন মানুষ পৌঁছে গেলো তখন সেখান থেকে বের হয়ে সে গাধার কাছে গিয়ে নিজেকে লুকালো। মোটকথা একঘন্টা যাবৎ এই অবস্থাই চললো যে, সে পালাতে লাগলো আর বাদশাহর চাকর-নফর শুধু নয়, বরং খোদ বাদশাহও তার পিছনে পিছনে ঘুরতে লাগলো। কিন্তু নিজের অযোগ্যতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে সে ফিরে এলো না।

আমাদের যেমন নামায ঃ
তারজন্য শাস্তি না হওয়াই বড় রহমত

এখন আপনারাই বলুন—এই ব্যক্তিটি কোন শাস্তির উপযুক্ত নাকি এখনও তার প্রতি বাদশাহর সদয় থাকা উচিত? তার শাস্তি তো ছিলো এটা যে, প্রথম বার যখন সে অযোগ্যতার কাজ করেছে, তখনই তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে দরবার থেকে বের করে দেওয়া, ভবিষ্যতে কখনো দরবারে আসার অনুমতি না দেওয়া এবং বাদশাহকে অপমানিত করার জন্য শাস্তি দেওয়া। আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাবো আমাদের অবস্থাও এই গোলামের মতই। আল্লাহ তাআলার আচরণ আমাদের প্রতি কত মেহেরবানীপূর্ণ! তাঁর পক্ষ থেকে অনুমতি রয়েছে প্রতি মুহূর্তে হাযিরা দেওয়ার। যখনই মন চায়, নফল নামায পড়ুন, দুই-তিনটি

সময় ব্যতীত। সেই সময়গুলোতে অনুমতি নেই ; যেমন সূর্য উদয়ের সময় এবং এই রকম কয়েকটি সময়। বাকী সকল সময়ে অনুমতি রয়েছে। কিন্তু আমাদের সামর্থ্য হয় না সেই অনুমতিকে গনীমত মনে করার। অবশেষে পাকড়াও করে নিয়ে যাওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে যাই অর্থাৎ ফরয নামাযের সময় চলে আসে। আমরা তখনও উদাসভাবে হেলেদুলে হাযির হই, নিম্নমানের ওযু করি এবং বাধ্য-বাধকতার সাথে নামাযের নিয়ত করি অর্থাৎ সামনে কথাবার্তা বলার জন্য দাঁড় করানো হলো, দাঁড়ানো মাত্রই এমনভাবেই মুখ ঘুরিয়ে নিলাম যে, কোন খবরই থাকলো না। শুধু মুখে শব্দ উচ্চারণ করতে লাগলাম, ধোঁকা দেওয়ার জন্য বাদশাহর তা'রীফ করে চললাম। অর্থাৎ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ পড়লাম। আল্লাহ তাআলা এই মুখ ঘুরানোর প্রতি লক্ষ্য করলেন এবং কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করলেন। আলহামদুলিল্লাহ শরীফের প্রতিটি আয়াতের উত্তর দিতে লাগলেন ; হাদীসে যেমন এসেছে। আমাদের কানে তাঁর জবাবের মৃদু গুঞ্জরণ যখনই পড়লো তখনই আমরা এমনভাবে পালিয়ে গেলাম যে, সোজা বাড়ি এসে নিঃশ্বাস গ্রহণ করলাম। কখনো বিবির কাছে, কখনো বাচ্চাদের কাছে, কখনো জমিতে ঘুরতে লাগলাম। কখনো এখানকার চিন্তা, কখনো ওখানকার স্বার্থ—এমনই পাগলামো করে চললাম। অবশেষে বড়ই মুসকিলের সাথে দরবারের উপস্থিতি সমপ্তি পর্যন্ত পৌঁছলো অর্থাৎ সালাম ফেরানো হলো। যেন খুব ভালো হলো যে, বাদশাহর সাথে কথোপকথন করা থেকে বেঁচে গেলাম। না জানি সে কেটে খেয়ে ফেলতো অথবা কিছু একটা করতো। কিন্তু এই খবর নেই যে, কথোপকথন হলে কতকিছু পাওয়া যেত।

বন্ধুগণ! এখন এই গুস্তাখিপূর্ণ নামাযের দ্বারা আমাদের সেই শাস্তিই প্রাপ্য, যা ঐ গোলামের প্রাপ্য ছিলো। এর শাস্তি এটা হওয়া উচিত ছিলো যে, যদি একবারও আমরা এমন নামায পড়ি, তাহলে যেন কখনো আল্লাহ তাআলার দরবারে আমাদেরকে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয় এবং দরবার থেকে বাহির হয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই এই হুকুম জারি হয়ে যায় যে, একে চিরকালের জন্য জেলখানায় পাঠিয়ে দাও। কিন্তু আপনারা এবার আল্লাহর মেহেরবানী ও দয়াশীলতা দেখুন!

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

তিনি হুকুম যখন করলেন তখন এই হুকুম করলেন كَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوْرًا। ‘যে তারা বহু ভালোকাজ করেছে।’ আমরা যেই ভালো কাজ করেছি, তা আমাদের অন্তরই ভালো জানে, তার জন্য আমাদের মরে যাওয়া উচিত। যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং আমাদের কাজ–কর্ম দেখেছিলেন, তাদের সামনে আমাদের মর্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি এরশাদ করেন—তাদের মন্দকাজগুলোকে আমি নেকীর কাজ দ্বারা পরিবর্তন করে দিবো। এরা তো নির্বোধ। তারা কত গুস্তাখি করেছে। কিন্তু আমি সেই আসাটাকেও উপস্থিতি হিসাবে লিখে রাখি। এবং তাদেরকে সেই সম্মানই প্রদান করা হবে, যা বিশেষ আগন্তুকদের জন্য করা হয়ে থাকে।’ এবার বলুন ! যদি কোন বাদশাহ একবার কারো সঙ্গে এমন আচরণ করে, তাহলে কি সেই ব্যক্তির সাহস হবে আবারো তেমনি অযোগ্যতা ও ধৃষ্টতার সাথে দরবারে হাযির হওয়ার। কিছুতেই না ; বরং লজ্জায় আপাদমস্তক ঘামে নিমজ্জিত হয়ে যাবে এবং এমনটি করার হিম্মত কখনো আর হবে না তার। কিন্তু আমরা এমনই অকৃতজ্ঞ যে, এক–দুইবারের কী অর্থ, হাজারো বার, বরং প্রতিদিন পাঁচবার এই ধৃষ্টতাই করি। কিন্তু অপরদিক থেকে সেসবের কোন কিছুর প্রতিই লক্ষ্য করা হয় না। এতে আশ্চর্যজনক বিষয় এটাই যে, একে তো আমাদের এই আমল পঙ্গু ও বিকলাঙ্গ, দ্বিতীয়ত তার ওপর কোন যত্ন ও ধারাবাহিকতা আমরা রক্ষা করি না। বরং উল্টা আরো নাজায়েয কাজ করি। বন্ধুগণ ! সামান্য শরম বোধ করুন, নেক কাজ করুন এবং হারাম থেকে বাঁচুন ; বিশেষত রমযান মাসে। এটা হলো রোযার মাঝে যেসব দোষ বা অসিদ্ধতা লোকেরা করে রেখেছে, তার বর্ণনা।

তারাবীহর মাঝে যেসব অসিদ্ধতা চালু আছে, তার আলোচনা

এবার রমযানের আরো একটি খাস আমল রয়েছে। দিনের আমল যেমন রোযা, রাতের আমল তেমনি তারাবীহ। এক্ষেত্রে লোকেরা এই গোলমাল করে রেখেছে যে, তারাবীহর বিশ রাকাত সংখ্যায় ঠিকই পূরণ করে নেয়, কিন্তু তাদের এই পাত্তা থাকে না যে, তারাবীহর মাঝে তওরাত

পড়া হয় নাকি ইঞ্জিল পড়া হয়। এত দ্রুত পড়ে থাকে যে, হয় শুরুর হরফটা বুঝে আসে নয়তো রুকূতে যাওয়ার সময় যেই আল্লাহু আকবর বলা হয়, সেটা বুঝে আসে। এক হাফেযের কাহিনী। কুরআন শরীফ পড়তে পড়তে যেখানে গিয়ে ভুলে যায়, সেখানে নিজ থেকে বানিয়ে পড়ে দেয়। দীর্ঘকাল পর্যন্ত তার খুব তারীফ হয়ে এসেছে যে, কোথাও তার মুতাশাবেহও (শব্দের মিল থাকায় এক আয়াত থেকে আরেক আয়াত কিংবা এক সূরা থেকে আরেক সূরায় ভুলে চলে যাওয়া বা প্যাঁচ লেগে যাওয়া) লাগে না। لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

বন্ধুগণ! আল্লাহ তাআলাকে ধোঁকা দিয়েন না। পূর্ণ বিশ রাকাত যেমন হিসাব করেন, তেমনি সেই বিশ রাকাতকে যথানিয়মে সুষ্ঠুভাবে আদায়ও করুন। এই একটি যুলুমও হয়ে থাকে যে, হাফেয অনেক সময় নামাযীদেরকে ভাগিয়ে দেয়। রাকাত এতই লম্বা লম্বা করে থাকে যে, কেউ থাকতেই পারে না। এক এক রাকাতে পাঁচ পাঁচ পারা; বলুন! এরপর আর কে থাকে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন—সুসংবাদ শোনাও এবং বিতৃষ্ণা প্রদান করো না, সহজ করো এবং সংকীর্ণতায় ফেলে দিও না।' হাঁ যদি এমনই তীব্র আগ্রহ থাকে, তাহলে তাহাজ্জুদে যত চান পড়ুন। কারো শরীক হওয়ার আগ্রহ থাকলে তাতে শরীক হয়ে যাক। তবে, তাতেও যেন ইমাম ব্যতীত তিনের অধিক মানুষ জামাতে না থাকে। কারণ, কিতাবসমূহে সেটাকেও মাকরূহ লিখেছে।

শবীনার মাঝে বিরাজমান দোষ-অসিদ্ধতার আলোচনা

কোন কোন লোক এক রাতেই পূর্ণ কুরআন শরীফ খতম করে থাকে, যাকে শবীনা বলা হয়। এর মাঝে কয়েকটি বিদআত বিদ্যমান। চিন্তা করে দেখুন। এর মাঝে প্রদর্শনের নিয়ত থাকে। যে ব্যক্তি এই শবীনার ব্যবস্থা করে তারও এই নিয়ত থাকে, ইমাম এবং শ্রোতাদেরও এই নিয়ত থাকে। ইমাম তো থাকে প্রশংসা ও তারীফের আকাঙ্খী। যেখানে সালাম পায় এবং মুখের ওপর লোকে প্রশংসা করে সেখানে আনন্দিত হয়, খুশী

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

হয়। যদি কেউ তা'রীফ না করে, তাহলে পড়াতেও যায় না। হাদীসে হুকুম করা হয়েছে—প্রশংসাকারীর মুখে মাটি নিক্ষেপ করো। শবীনার মাঝে যে ইমাম হয়, তা'রীফের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া তার ওপরও পড়ে। এমনকি কোন কোন ইমাম তো তা'রীফ করানোর উদ্দেশ্যে 'লুকমাও' গ্রহণ করে না। এই কথা ভেবে নিজে নিজেই পড়ে যেতে থাকে যে, আবার লোকে না বলে ফেলে, ভালো ইয়াদ নেই। যেসব ব্যক্তি শবীনার ব্যবস্থা করে, তারা তো নামাযে এসেও শামিল হয় না। চা-পানির ব্যস্ততা থেকে তো তাদের ফুরসুতই মিলে না। আমি জিজ্ঞাসা করি, শবীনা কি চা-পানি পান করার জন্য করা হয়, নাকি কুরআন শরীফ শোনার জন্য? যাই হোক, বুঝা গেলো যে, তাদের উদ্দেশ্য এটাই যে, লোকজন জানুক আমাদের এখানে অমুক মসজিদে উত্তম ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই চা-পানির আয়োজন তো ভালোই থাকে, কিন্তু আসল জিনিসটাই ছুটে যায়। বাকী রইলো শ্রোতাদের প্রসঙ্গ।

ইনসাফের সাথে বলুন! তারা কুরআন শরীফ শুনতে আসে, নাকি নামাযের প্রতি মনোযোগ দিতে আসে? কিছু দাঁড়িয়ে থাকে, কিছু থাকে বসে, কিছু কখনো দাঁড়িয়ে যায়, কখনো বসে যায়, আবার কিছুলোক কখনো বসতেও না পারলে নিয়ত ছেড়ে দিয়ে শুয়ে শুয়ে শুনতে থাকে। করবে কী বেচারা! কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত কিভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে? আর কিছুলোক, হিম্মত করে যারা দাঁড়িয়েই থাকে, ইমামের ত্রুটিসমূহ ছেড়ে দিয়ে থাকে। ইমাম যেই পর্যায়ের ভুল-ত্রুটিই করে যাক, তারা বলতে পারে না। কেননা তারা মনে করে, বললে ক্ষতি হবে, কুরআন শরীফ খতম না হয়ে বাকী থেকে যাবে। কেউ কেউ তো এমন গযবও করে বসে যে, নামাযে তো শরীক হয় না, বসে বসেই ইমামকে 'লুকমা' দিয়ে থাকে। এই অবস্থায় ইমাম যদি লুকমা গ্রহণ করে নেয়, তাহলে নামায ভেঙে যাবে আর যদি লুকমা গ্রহণ না করে, তাহলে ত্রুটি রয়ে যায়। ত্রুটির কারণে যদি অর্থে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রেও নামায দুরস্ত হবে না। এ পর্যায়ে শ্রোতাদের সকল মেহনত বেকার গেলো, নিষ্ফল হলো। মুফতের মধ্যে বেচারাদের কষ্টও হলো। মোটকথা এমন অবস্থায় যদি লুকমা গ্রহণ করে, তবুও নামায হবে না আর গ্রহণ

না করলেও নামায দুরস্ত হবে না। এখন এই সকল অবস্থাকে মিলিয়ে আপনারাই বলুন! এটা কি নামায, নাকি খেলা? শরীয়তের নিয়ম–অনুযায়ী যখন নামাযই হলো না, তখন কবুল হবে কিভাবে?

শবীনার মাঝে আরো একটি দোষ লোকেরা এটা করে রেখেছে যে, অধিকাংশই এমন হয় যে, নফলের জামাত করা হয়। কেননা কমসংখ্যক লোকই এমন হয়ে থাকে, যারা তারাবীহর জামাতে এটা করতে সক্ষম। অধিকাংশ নামাযী তো এমন হয়ে থাকে, যাদের দ্বারা এটা সম্ভব নয় যে, শেষ পর্যন্ত শরীক থাকবে এবং তার মাঝে তারাবীহ পুরা করবে। এজন্যই প্রথমে ইমাম–মুক্তাদি সকলেই তারাবীহ আলাদা পড়ে নেয় এবং তারপর নফল নামাযে শবীনা পড়ে। অথচ নফল নামাযে জামাত মাকরূহ। মোটকথা শবীনার মাঝে লোকেরা অনেক দোষ, অসিদ্ধ কাজ চালু করে রেখেছে। সেসবের মধ্য থেকে এটাও একটা যে, কোন কোন হাফেয নিজ নিজ পড়া শেষ করার পর এসে শরীক হয়, যেন ইমামকে ত্রুটির মধ্যে ফেলা যায় এবং তাকে ঘুরানো যায়। এখানে তো আপনি বলে ফেলতে পারেন—এরা শুনতে আসছে, এতে তো কোন বেয়াদবী হচ্ছে না। কিন্তু নিয়তটাকে তো সামান্য হলেও দেখবেন। এ ধরনের বহু বিদআত এর অন্তর্ভুক্ত করে রাখা হয়েছে শবীনাকে। হাঁ যদি শবীনার মাঝে আপনাদের শুধু এই নিয়তই থাকে যে, কুরআন শরীফ পূর্ণ পড়া হোক, তাহলে উত্তম কথা। কিন্তু নিয়তকে ভালোভাবে যাচাই করুন যে, তাতে প্রদর্শন ইত্যাদি আরো কিছু মিশে যাচ্ছে কিনা। এমন প্রচার করবেন না যে, আমাদের এখানে শবীনা হবে; তাহলে সেই একই প্রদর্শন হবে, খালেস নিয়ত থাকবে না। যতটুকু হিম্মত হয় কুরআন শরীফ পড়ুন, ইমামকে গোলমালের মধ্যে ফেলবেন না আর যত অসিদ্ধ কাজ ও দোষ এর মাঝে চালু করে রাখা হয়েছে, তা থেকে বেঁচে থাকবেন।

পরমহিলাকে তারাবীহর মাঝে কুরআন শরীফ শুনানো মন্দ থেকে মুক্ত নয়

লোকেরা রমযানে এই একটি বিদআত করে রেখেছে যে, হাফেয বাড়ীতে গিয়ে পরমহিলাদেরকে মিহরাব (কুরআন শরীফের তেলাওয়াত)

শুনায়। এর মাঝে অনেক দোষ ও অসিদ্ধতা বিদ্যমান। একটি হচ্ছে, পরপুরুষ যখন সুন্দর কণ্ঠে পড়ে, তখন তার আওয়ায মহিলাদের শোনা এমনই নিষিদ্ধ, যেমন নিষিদ্ধ পুরুষের জন্য পরমহিলাদের আওয়ায শোনা। অথচ রেওয়াজও এটাই যে, সুন্দর কণ্ঠের পুরুষ খোঁজ করা হয়। এদিকে হাফেয সাহেবও, পুরুষদের জামাতে সরল ও সাধাসিধাভাবেই হয়ত পড়েন ; কিন্তু মহিলাদের মাঝে যথেষ্ট কণ্ঠ ও সুর আরোপ করে পড়েন। বলুন! মহিলাদের জামাতের প্রয়োজনটা কী? প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্নভাবে পড়ুক। তাদের তো মেহরাব শোনারও কোন প্রয়োজন নেই। মহিলাদের যদি কেউ হাফেয হয়ে থাকে তাহলে একা একা নিজের তারাবীহর মাঝে খতম করে নিক। আর যদি হাফেয না হয়ে থাকে, তাহলে أَلَمْ تَرَ كَيْفَ থেকে পড়ুক এবং তেমন আগ্রহ থেকে থাকলে প্রতিদিন যতটুকু সম্ভব নাযেরা কুরআন শরীফ পড়ে নিক। পরপুরুষের সুন্দর কণ্ঠের আওয়াজ শুনে শুনে কেন টাকা খরচ করে গুনাহ কিনে আনছেন? দ্বিতীয় বিদআত এক্ষেত্রে লোকেরা এটি করে রেখেছে যে, হাফেযকে পারিশ্রমিক দিয়ে কুরআন শরীফ পড়ানো হয়ে থাকে। অথচ ইবাদতের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা হারাম।

মুর্দার কবরে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কুরআন শরীফ পড়ানো হারাম

এই আলোচনা থেকে এটাও জানা হয়ে গেলো যে, কবরের সামনে কুরআন শরীফ পড়ার জন্য হাফেয নিযুক্ত করা জায়েয নেই। কেননা এক্ষেত্রেও এই বিষয়টি বিদ্যমান যে, ইবাদতের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে কোন কোন লোক বলে থাকে যে, আরে সাহেব! মৌলবীদের যে কী হলো, মুর্দার প্রতি সওয়াব পৌঁছানোও বন্ধ করিয়ে দিলো। আমি বলি—মুর্দার সওয়াব তো পৌঁছেইনি, সেটা আবার বন্ধ করাবে কিভাবে? কারণ সওয়াব পৌঁছার পদ্ধতিটি হচ্ছে এই যে, প্রথমে ইবাদতকারী সওয়াব পাবে, তারপর তার ইচ্ছা থাকবে যাকে ইচ্ছা হয় তাকে দান করার ; যেমন নিজের ধনসম্পদ, যাকে ইচ্ছা হয় দান করতে পারে। আর এখানে তো ইবাদতকারী নিজেই কোন সওয়াব পায়

৩

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

নাই, অপরকে সে কী দান করবে? কেউ কেউ বলে—আমরা হাফেযকে তারাবীহর মাঝে মেহরাব শুনানোর পারিশ্রমিক দেই না। এ কারণেই আমরা পূর্ব থেকে নির্ধারণও করি না যে, এত টাকা দেবো। কিন্তু আপনাদের জানা নেই, যে বিষয়টি প্রচলন পেয়ে যায়, সেটিকে নির্ধারণ করা—না করা সমান কথা। যদি হাফেয সাহেব কোনভাবে জানতে পারে যে, এখানে কিছুই পাওয়া যাবে না, তাহলে রমযানের মাঝেই হাফেয সাহেব তারাবীহ ছেড়ে দিয়ে বসে থাকবে। অবশ্য যদি টাকা দেওয়ার রেওয়াজ না থাকে এবং কোন কিছু ফুরানোও না হয়, তাহলে সে অবস্থায় যা কিছু দেওয়া হবে, তাতে কোন দোষ নেই, বরং হাফেযদেরকে এইভাবেই দিতে থাকুন। এখন অবশ্য এভাবে দেওয়ার রীতি নেই, একারণেই হাফেয বেচারাদের নিয়ত খারাপ হয়ে গেছে। যদি তাদেরকে আকাঙ্খা ছাড়া এবং বাহানা ছাড়াই টাকা দেওয়া হতো, তাহলে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টিরই সুযোগ থাকতো না।

এক তালেবে এলমের ঘটনা

এক তালেবে এলমের কাহিনী হলো, সে এক জায়গায় পড়তে গিয়েছে, খানার সুষ্ঠু ব্যবস্থা হয়নি। ঘটনাচক্রে সেখানে এক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলো। ঘটনাটি অন্য সকলের জন্য ছিলো দুঃখ ও বেদনার ব্যাপার, কিন্তু সেই বেচারার জন্য ঈদের দিন চলে এলো। তার খানার ব্যবস্থা চল্লিশ দিনের জন্য ঠিক হয়ে গেলো। সে এটাকে গনীমত মনে করলো। চিল্লা যখন শেষ হতে চলেছে, তখন তার দুঃশ্চিন্তা হলো—আবার সেই অভুক্ত থাকার পর্ব আসছে। ঘটনাচক্রে চিল্লা শেষ না হতেই আরো একজন মৃত্যুবরণ করলো। ফলে তার আরো এক চিল্লার ব্যবস্থা হয়ে গেলো। এভাবেই একের পর এক বেশ কয়েকজন নাদুস-নুদুস ব্যক্তি ধরাশায়ী হলো। সেই তালেবে এলমের ফূর্তি লেগে গেলো এবং প্রতি মুহূর্তে সে অপেক্ষা করতে লাগলো, হায় কোনভাবে যদি কেউ মরতো! একদিন একব্যক্তি বললো—এই তালেবে এলম গোটা মহল্লা ধরেই এভাবে খেয়ে যেতে থাকবে, সেটা না চাইলে তার খানার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে দাও।' এভাবেও কখনো কখনো আল্লাহ তাআলা খানা পৌঁছিয়ে থাকেন।

হাফেযদের নিয়ত নষ্ট হলো কিভাবে

কি কারণে ইবাদতের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ শুরু হলো

মোটকথা খারাপ নিয়তের এই পালা কিভাবে শুরু হলো? শুধু এ কারণে যে, হকদারদের খবর নেওয়া হয় না। এমনিতে তো নিরামিষও জুটে না, তবে বৃহস্পতিবার হালুয়া চলে আসে। যখন কোন মৌলবী সাহেব বলে যে, বৃহস্পতিবারের সাথে খানা দেওয়াকে কেন নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, তখন খারাপ লাগে।

সুধীবৃন্দ! চিন্তা করুন তো! আটদিনের খানা কি একদিনে খেতে পারবেন? গরীব তালেবে এলম কি অপরাধ করলো যে, সপ্তাহভরে তাকে ভুখা রাখবেন আর একদিন এতটুকু এনে দিবেন যে, সে খেতে পারে না। উচিত তো তাদের খেদমত করতে থাকা, যেন তাদের নিয়ত নষ্ট না হয়ে যায়। কিন্তু মানুষ এমন করে না। কারণ হলো, দ্বীনের খেদমতকারীদেরকে লোকেরা তুচ্ছ ও হেয় মনে করে। এজন্যই তাদের কোন সম্মানও করা হয় না, তাদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণও করা হয় না এবং এ কারণেই এই রেওয়াজ হয়ে গেছে যে, আযানদাতার জন্য সেই অর্থ নির্ধারণ করা হয়, যা কারো কাজে লাগে না। পঙ্গু, বিকলাঙ্গ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, যে ব্যক্তি কোন কাজের উপযোগী থাকে না, আযান দেওয়ার পেশা সে নিয়ে নেয়। অতঃপর কেউ তার খবর নেয় না। এজন্যই তাদের নিয়ত নষ্ট হয়ে গেছে।

একজন এক মুর্দার চাদর দিয়েছিলো এক ফকীরকে। আযানদাতা যখন এই সংবাদ জানতে পারলো, তখন সঙ্গে সঙ্গেই সে গিয়ে হাযির হলো এবং বললো—আরে সাহেব! আমার হক তাকে দিয়ে দিলেন। আল্লাহ আল্লাহ করতে করতে এইদিনটি আসলো। এমন দিনেও আমাদের হক অন্যদেরকে দিয়ে দেন।' নিঃসন্দেহে এটাই আসল কথা। অনেক অপেক্ষার পর এমন দিন ভাগ্যে জুটে তার। কিন্তু এতে তার কোন দোষ নেই, বরং দোষ মহল্লাবাসীরই; তারা কেন এই সুযোগ ও পর্ব তাকে দিল। সঙ্গত হয়, আমরা যদি সিদ্ধান্ত করে নেই, এগার মাসে যেখানে আমরা নিজেদের জন্য পোশাক বানাই, সেখানে একটি পোশাক তাকেও বানিয়ে দেবো। আপনারা যে খাবার খান, কখনো কখনো সে

খাবারে তাদেরও দাওয়াত করবেন এবং নিজেদের খরচের টাকার সাথে তাদের জন্যও কিছু টাকা বাহির করবেন।

মোটকথা রমযান ছাড়া অন্যান্য মাসেও আমরা যদি হাফেযদের যথারীতি খোঁজ-খবর রাখতে থাকি, তারপর রমযান শরীফে যদি তাদের বলা হয়, কুরআন শরীফ শুনান, তাহলে কি তারা শোনাবে না? অবশ্যই আনন্দের সাথে রাজি হয়ে যাবে। এবং তাতে কোন দোষ ও অসিদ্ধতা থাকবে না। কেননা এক্ষেত্রে ইবাদতের বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিক থাকেনি। আসল কথা হলো, পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে হাফেযকে দিয়ে কুরআন শরীফ পড়ানো জায়েয নেই। এমনইভাবে মহিলাদেরকেও ঘরে গিয়ে কুরআন শরীফ শুনানো সঙ্গত নয়। আর মহিলাদের পূর্ণ কুরআন শরীফ শোনার প্রয়োজনটাই বা কী? শরীয়ত যেহেতু তাদের ওপর এটা ফরয করেনি, তাই এটা তাদের দায়িত্বে অবশ্যই নেই। শুধু اَلَمْ تَرَ كَيْفَ থেকে তারা তারাবীহ পড়ে যাবে। এক্ষেত্রে আরো একটি অসিদ্ধতা এটি হয় যে, যখন এক স্থানে মহিলাদেরকে শুনানোর জন্য হাফেয নির্ধারণ করা হয়, তখন সারা মহল্লা থেকে মহিলারা এসে সেখানে একত্রিত হয়। অথচ প্রয়োজন ব্যতীত ঘর থেকে মহিলাদের বাহির হওয়া জায়েয নেই। হাদীস শরীফে এসেছে—মহিলা হচ্ছে লুকায়িত, আচ্ছাদিত থাকার বিষয়। তাই মহিলাদের এভাবে সমবেত হওয়া বৈধ হয় না। কারন মেহরাব শোনা তাদের জন্য জরুরী নয়।

খতমের দিন অধিক বাতি জ্বালানোর মাঝে কি কি অসিদ্ধতা

রমযান শরীফে লোকেরা একটি বিদআত এটি করে রেখেছে যে, কুরআন শরীফ খতমের দিন বহু বাতি জ্বালিয়ে রাখে এবং প্রয়োজনের অধিক আলোর ব্যবস্থা করে। লোকে বলে এর দ্বারা দ্বীনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। আমি জিজ্ঞাসা করি, শুধু রমযানেই কি দ্বীনের সৌন্দর্য দানের প্রয়োজন, নাকি অন্যসব মাসেও? তাহলে সর্বদাই বহুসংখ্যক বাতি জ্বালানোর ব্যবস্থা করুন অথবা বলুন, অন্যদিনগুলোতে দ্বীনকে গোপন

করে রাখার হুকুম রয়েছে। ভালোভাবে জেনে রাখুন—সৌন্দর্য এবং সম্মান নেক কাজ-কর্মের দ্বারাই হয়ে থাকে।

দ্বীনের সৌন্দর্য দ্বীনের দ্বারাই,
হযরত উমর (রাদিঃ)এর ঘটনা

আপনারা হযরত উমর (রাদিঃ)এর ঘটনা হয়তো শুনেছেন যে, তিনি যখন শাম দেশে গেলেন এবং খ্রীষ্টানদের শহরের কাছে পৌঁছলেন, তখন তাঁর পোশাক ছিলো তালি লাগানো এবং তাঁর সওয়ারীর উটে—যা তাঁর সঙ্গে ছিলো—স্বয়ং তিনি সওয়ার ছিলেন না ; বরং তাতে সওয়ার হয়েছিলো তাঁরই গোলাম। লোকেরা বললো—এটা নিজের সম্মান ও মর্যাদা দেখানোর ক্ষেত্র, কমচেয়ে কম ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে যান। তিনি লোকজনের পক্ষ থেকে বহু কথাবার্তা শুনে বিষয়টি মঞ্জুর করে নিলেন। যখন তিনি ঘোড়ায় সওয়ার হলেন, তখনই ঘোড়া চিৎকার ও লম্ফ-ঝম্প দিতে শুরু করলো। তৎক্ষণাৎ তিনি ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। কারণ, তার দ্বারা নফসের মাঝে মন্দ অনুভূতি এবং আত্মমুগ্ধতা জন্ম নেয়। লোকেরা সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনের যে প্রয়োজনের কথা বলেছিলো, তার জবাবে তিনি বললেন—আমরা সেই জাতি যে, দ্বীনের দ্বারাই আমাদের সম্মান ও মর্যাদা। বলুন ! চেরাগ-বাতি দিয়ে দ্বীনের সম্মান কিভাবে হতে পারে? দ্বীনের সম্মান তো দ্বীনের দ্বারাই। দ্বীনের অনুশাসনের পরিপূর্ণ পাবন্দী করুন। আমি বলি—আপনারা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি যদি মসজিদে সাজসজ্জা ও সৌন্দর্যের ব্যবস্থা করে, তাহলে কি তার দ্বারা আপনাদের এমন আনন্দ অনুভব হবে, যেমন নিজের পয়সা খরচ করে সৌন্দর্যের ব্যবস্থা করলে আপনাদের সুখ বোধ হয়?

ভেবে দেখুন ! অন্য কেউ করে দিলে এমন আনন্দ কিছুতেই আপনারা বোধ করবেন না। অতএব বুঝা গেলো যে, শুধু নাম কামানোর জন্যই লোকে এগুলো করে ; তা নাহলে সৌন্দর্য তো উভয় অবস্থাতেই সমানই থাকে, অন্যলোক সৌন্দর্যের ব্যবস্থা করলে আনন্দ কম হয় কেন? এই অপ্রয়োজনীয় ও অপব্যয়ের স্থলে উত্তম ছিলো এই টাকা মালিকের

অনুমতি নিয়ে মুআযযিনকে দিয়ে দেওয়া। কিন্তু তাকে দিবে কেন? তাকে দিলে নাম হবে কিভাবে?

অপব্যয় কাকে বলে

আপনারা হয়ত মনে করছেন এটা অপব্যয় নয়। আমি বলি অপব্যয়ের অর্থই তো এটা যে, সম্পদ ব্যয় করা হবে এবং তাতে কোন নেক উদ্দেশ্য থাকবে না। সে হিসাবে এটা অপব্যয় হবে না কেন? এর মাঝে ভালো কী উদ্দেশ্য আছে? যেহেতু বহু বাতি জ্বালানো হয় দেখানোর জন্য, এজন্যই তা জায়েয নেই। কেননা দেখানোর জন্য কাজ করা গুনাহ। তারপর এসব লোকেরা এটাকে সওয়াব মনে করে থাকে ; কী মারাত্মক ভুল। এই দোষ ও অসিদ্ধতাগুলো রয়েছে অধিক আলোকিতকরণের মাঝে। উপরন্তু এই অসিদ্ধতার কথা ভিন্ন যে, ব্যবস্থপনাকারীরা আলো নিয়েই ব্যস্ত থাকে, নামাযে তাদের মন থাকে না। কখনো তারা নামাযেও শরীক থাকে না। অমুক দিনের তারাবীহ তাদের মাফ হয়ে যায়। কখনো কাতারের মাঝখান দিয়ে চলাফেরা করতে থাকে। কখনো এক কাতার থেকে অন্য কাতারে চলে যায়। অথচ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন—

যে ব্যক্তি ঘাড়ের উপর দিয়ে লাফিয়ে যাবে, কেয়ামতের দিনে তাকে এমনভাবে পুলের মত ফেলে রাখা হবে যে, তার উপর দিয়ে মানুষ হেঁটে যাবে। এই পরিমাণ অসিদ্ধতা ও খারাবী বিদ্যমান এই আলো ও আলোকসজ্জার মাঝে। আমি বলি—কুরআন শরীফ এবং হাদীস শরীফের মাঝে যেসব হুকুম-আহকাম রয়েছে, সে অনুযায়ী যদি মুসলমানেরা আমল না করে, তাহলে কে করবে?

সামান্য ভাবুন তো! সেই হুকুম-আহকামকে শুধু দেখে নেওয়া আর পড়ে নেওয়ার দ্বারা কী কাজ হতে পারে—যতক্ষণ পর্যন্ত সে অনুযায়ী আমল না করে? মুসলমানদের অবস্থা হলো এই যে, এইসব বিধি-বিধান তার পড়ে ফেলে, দেখে নেয়, কিন্তু আমল করে না। অবস্থা যদি এমনই হয়, তাহলে এটাও আশ্চর্যের কিছু নয় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেয়ামতের দিনে আল্লাহ তাআলার দরবারে আমাদের

বিরুদ্ধে নালিশ করে বলবেন—

يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَ الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا

[তরজমা—হে আমার রব প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আমার জাতি এই কুরআনকে পরিত্যক্তরূপে গ্রহণ করেছে।]

বন্ধুগণ! কুরআনকে শুধু ঘরে রাখা আর মুখে মুখে পড়ার দ্বারা পূর্ণাঙ্গ কাজ হতে পারে না। বরং তার মাঝে যেসব বিধি-বিধান রয়েছে, সেগুলোও দেখুন, অন্তরের মাঝে বদ্ধমূল করুন এবং সে অনুযায়ী আমল করুন।

খতমের দিনে মিষ্টি বিতরণে কী কী অসিদ্ধতা ও দোষ থাকে

আরো একটি অসিদ্ধতা খতমের দিনে লোকেরা এই করে রেখেছে যে, তারা মিষ্টি বিতরণ করে। এই অসিদ্ধতা দৃশ্যত যদিও বুঝা যায় না, কিন্তু আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এই মিষ্টি হয়তো কোন এক ব্যক্তির পয়সায় আসে, তখন তার মাঝে অসিদ্ধতা হলো এই যে, সেই ব্যক্তির নিয়ত থাকে প্রদর্শন করা এবং নাম কামানো। আর চাঁদা দিয়ে যদি মিষ্টির ব্যবস্থা হয়ে থাকে তাহলে তার মাঝে অসিদ্ধতা হলো, চাঁদা তোলা হয় জোরপূর্বক এবং তার দ্বারা মানুষের অন্তর ব্যথিত হয়। অন্তরে আঘাত দিয়ে কিছু গ্রহণ করা এমনই, যেমন মারপিট করে নেওয়া হয়। যখন অন্যকে প্রভাবিত করে, লজ্জা দিয়ে গ্রহণ করা হলো, তখন তার মাঝে জবরদস্তি প্রয়োগ হওয়ার ব্যাপারে কী সন্দেহ থাকলো?

ইমাম গাযালী (রহঃ) লিখেছেন—লজ্জা দিয়ে, প্রভাবিত করে নেওয়া এমনই, যেমন লাঠির জোরে নেওয়া হয়। আল্লাহ তাআলা সেই অল্পের মাঝে বরকত দেন, যা খুশীর সাথে দেওয়া হয়। খুব কম লোকই এদিকে লক্ষ্য রাখে। অধিকাংশ মসজিদের চাঁদা এমন পন্থায় করা হয় এবং এমন লোকজন চাঁদা আদায় করে, দাতার উপর যাদের প্রভাব পড়ে। দাতারা আদায়কারীদের প্রভাব ও অবস্থান বিবেচনায় নিয়েই চাঁদা দেয় এবং তারপর তার মাঝেও কিছু চাঁদা করা হয় অপ্রয়োজনীয় সৌন্দর্যের জন্য।

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

হাদীস শরীফে সে ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে ; সে সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা নিজের সম্পদ থেকে করা হলেও।

মসজিদ পাকা বানানো ভালো সাজসজ্জা করা সঙ্গত নয়

হাঁ মসজিদের ইমারত যদি মজবুত বানানো হয়, তাহলে কোন দোষ নেই। মসজিদ নির্মাণের মাল–মশল্লা ভালো লাগানো, অভিজ্ঞ নির্মাতা নিযুক্ত করা, পাকা ইটের ব্যবস্থা করা হলে তার মাঝে কোন অসিদ্ধতা নেই এবং যদি সামান্য সৌন্দর্যেরও ব্যবস্থা হয় তাতেও কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু এটাতো কোনভাবেই বৈধ নয় যে, লোকজনের কাছ থেকে জোরপূর্বক চাঁদা উঠিয়ে মসজিদ সাজানোর কাজে ব্যয় করা হবে। ছাপড়ার মসজিদও নামায পড়ার জন্য যথেষ্ট। কেননা নামাযের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তাআলার সামনে অক্ষমতা, কাতরতা প্রকাশ করা আর এক্ষেত্রে ছাপড়ার মসজিদ এবং পাকা মসজিদ উভয়েই সমান। বরং পাকা মসজিদে ফুলপাতার নকশায় কখনো কখনো মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। ছাপড়ার মসজিদে তো সাজসজ্জাই থাকে না যে, তার দ্বারা মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। সুতরাং নামাযের মূল মকসুদেই যখন ব্যাঘাত সৃষ্টি হলো, তখন সাজসজ্জা কী আর কাজে লাগবে?

খতমের মিষ্টির ক্ষেত্রে নিয়তের অসিদ্ধতার আলামত

এমনই অবস্থা হয়ে থাকে মিষ্টির ক্ষেত্রেও। কেউ মিষ্টি দিয়ে থাকে তারীফ করানোর জন্য, কারো কাছ থেকে মিষ্টি আদায় করা হয় প্রভাব সৃষ্টি করে। এর পরীক্ষা এভাবে হতে পারে যে, যদি পরবর্তীতে নামাযী অধিক সমবেত হয়ে যায়, তখন মিষ্টি নিয়ে ভাবনা–চিন্তা শুরু হয়ে যায়। যারা ব্যবস্থাপনাকারী, তারা তখন নিজেদের ইযযত নিয়ে শংকায় পড়ে যায়। নামাযীদের মাঝে এই কল্পনা চলতে থাকে, এখন একটি করে মাত্র বাতাশা মিলবে। এরপর নামাযে মনোযোগ দেওয়া বহু মাইল দূরের ব্যাপার হয়ে যায়। মিষ্টি আর কী আসলো, কতগুলো গুনাহ

কামানো হলো। এসব ছাড়াও আরো একটি বিষয় হলো, অধিকাংশ বেনামাযী লোকও চলে আসে এবং আশ্চর্য নয় যে, তাদের মাঝে অনেকে নাপাকও থাকে। অতঃপর লোকেরা কথাবার্তা বলতে থাকে, অপ্রয়োজনীয় গল্প-গুজব করতে থাকে, একে অন্যের দোষ বলে, গীবত করে, একে অন্যের যুলুমের হিসাব করে। মৌলুদ শরীফের মিষ্টির অবস্থাও একই। কোন কোন লোক বলে থাকে যে, আরব দেশে তো মিষ্টি বিতরণ করা হয়। আমি বলি—মন্দ কাজ কেউ করার দ্বারা ভালো হয়ে যায় না। তাছাড়া এ ব্যপারটাও রয়েছে যে, আপনাদের মাঝে এ পরিমাণ সরলতা নেই, যতটুকু আরবদের মাঝে রয়েছে। তাদের তো এমনই ভনিতাহীন অভ্যাস যে, যখন কিছুলোক বাকী থেকে যায় আর মিষ্টি শেষ হয়ে যায়, তখন তারা বলে দেয়—'খালাছ' অর্থাৎ মিষ্টি শেষ হয়ে গেছে। এখানকার মত তাদের ইযযত-সম্মান ইত্যাদির এত ভাবনা থাকে না। যাদের হাতে পৌঁছলো তো পৌঁছলোই। না পৌঁছলো তো সেদিকে কোন লক্ষ্যই নেই। সুতরাং আপনারা আপনাদের কাজকে তাদের কাজের সাথে কিভাবে সমান করবেন, কিভাবে মিলাবেন? আমি বলি, মিষ্টি বিতরণের রেওয়াজ শুরু হয়েছিলো এইভাবে যে, পূর্ণ কুরআন শরীফ শোনার দ্বারা আনন্দ আসে, সেই আনন্দের কারণেই মিষ্টি বিতরণ করা হয়। খোদ মিষ্টির বিতরণে কোন মন্দ বা অকল্যাণ ছিলো না। কিন্তু এখন তো তার মাঝে বহু মন্দ সৃষ্টি হয়ে গেছে। এজন্যই তাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত।

ঈদের রাতে রোযার নিয়্যতে না খাওয়া বিদআত

আমাদের শহরগুলোতে এই একটি রুসম বা প্রথাও ছড়িয়ে পড়েছে যে, লোকজন ঈদের রাতে (আগের রাতে) কিছুই খায় না এবং শেষ রাতে ফজরের আযানের অপেক্ষা করতে থাকে। আযান হয়ে যায়, তখন বলে থাকে যে, রোযা খুলে ফেলো। তারপর তারা কিছু খায়। তাদের কাছে এখনও পর্যন্ত রমযান মাসই বিরাজমান ছিলো। অথচ ঈদের চাঁদ দেখামাত্রই অন্যমাস শুরু হয়ে গেছে। ভেবে দেখুন—এটা কী পরিমাণ নির্বুদ্ধিতা! অন্য মাসের একটি রাত পর্যন্ত অতিবাহিত হয়ে গেলো আর

তাদের কাছে এখনও রোযাই চলছে।

হাদীস শরীফে আছে, চাঁদ দেখামাত্রই রোযা খতম করে দাও। আর তাদের মতে একটি রাত অতিরিক্ত অতিবাহিত করতে হবে, তারপর রোযা শেষ হবে। হয়তো কেউ বলতে পারে যে, হাদীসের ওপর তো আমল করেছি, চাঁদ দেখামাত্রই ইফতার করে নিয়েছিলাম ; এরপর রাতে খানা খাওয়া–না খাওয়া তো নিজেদের ইখতিয়ার, নিজের ইচ্ছা–স্বাধীনতা। তবে বুঝে নিন যে, খানা না খাওয়ার ব্যাপারে কোন বিধি–নিষেধ নেই। বরং তাকে রোযা মনে করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর পরিস্কার কথা যে, আপনারা তাকে রোযাই মনে করে থাকেন। তা নাহলে ফজরের আযান শুনে একথা বলতেন না যে, রোযা খুলে ফেলো। এর দ্বারা স্পষ্ট জানা যায় যে, সেই রাতে খানাপিনা ব্যতীত থাকাটাকে রোযা মনে করা হয়ে থাকে। আর এটা স্পষ্ট বিদআত। এমন পরিস্থিতিতে তো রুসম ও প্রথা ভাঙার জন্য নিজে ইচ্ছা করেই ফজরের পূর্বেই খাওয়া চাই।

ঈদের দিনে অপরিহার্য মনে করে সেমাই পাকানো বিদআত

ঈদের দিনে একটি রুসম, লোকে এটা করে থাকে যে, সেমাই অবশ্যই পাকানো হয়। যদি সেমাই না হয়, তাহলে তাদের কাছে যেন কোন কিছুই হলো না। তারা মনে করে থাকে, ঈদের দিনে বিশেষভাবে সেমাই হওয়াই চাই। অথচ শরীয়তের দিক থেকে সেমাই এবং অন্যান্য সববস্তুই সমান। সেমাইকে বেছে নেওয়ার কারণ শুধু এটাই ছিলো যে, ঈদের দিনে ঈদের বহু কাজকর্ম থাকে, তাই অধিক ঝঞ্ঝাটপূর্ণ কোন বস্তু সকাল–সকাল পাকানো সম্ভব নয়। কাঙ্ক্ষিত এটাই থাকে যে, সকালে কিছু খেয়ে ঈদগাহে যাওয়া হবে। কেননা ঈদের দিন সকাল–সকাল কিছু খেয়ে নেওয়া সওয়াবের কাজ। সেমাইয়ের প্রচলন হয়েছে এজন্যই। কারণ সেমাই সহজভাবেই তৈয়ার হয়ে যায়। তাতে কোন ঝঞ্ঝাট করার দরকার হয় না। পরবর্তীতে বন্ধুদের মাঝে, আত্মীয়–স্বজনের মাঝে সেমাই পাঠানোরও রেওয়াজ হয়ে গেছে। লোকজন বলে থাকে, ঈদের দিনটা

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

খুশীর দিন, বন্ধুদের কাছে উপহার কেন পাঠানো হবে না ; উপহারে তো মহব্বত ও আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায়।

রুসম করে হাদিয়া দেওয়ার দ্বারা আন্তরিকতা বাড়ে না, মনোবেদনা জাগে

কিন্তু এটি একটি প্রবঞ্চনা। কেননা রুসম করে কিছু দেওয়ার দ্বারা কোন আন্তরিকতা বাড়ে না, বরং আরো মনোবেদনা ও পেরেশানী সৃষ্টি হয়ে যায়। অভিজ্ঞতার দ্বারা এই বিষয়টি পরিস্কার হয় গেছে। হাঁ রুসম ও প্রথা ব্যতীত যদি আন্তরিকতা ও মহব্বতের সাথে কিছু পাঠানো হয় তাহলে তার দ্বারা অবশ্যই আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায় ; যেমন দুই বন্ধু কখনো কখনো পরস্পরের কাছে হাদিয়া পাঠায়। রুসমের দ্বারা আন্তরিকতা বাড়ে না। দেখুন ! পীর এবং মুরীদদের মাঝে কী পরিমাণ আন্তরিকতা বিরাজ করে। মুরিদ পীরকে নিজের প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসে, ধনসম্পদ তো সে তুলনায় তুচ্ছ বিষয়। এমন ভালবাসা অন্য কারো প্রতি হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এই পীর–মুরীদই যখন আপোষে রুসম ও প্রথাভিত্তিক আচরণ করে ; তখন তাদের মাঝে আর কোন আন্তরিকতাই বজায় থাকে না। অধিকাংশ মুরীদ পীরের খেদমত করে থাকে, তাকে হাদিয়া–উপঢৌকন দিয়ে থাকে এবং এর দ্বারা মহব্বত ও আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যখন এই হাদিয়া দেওয়াকে রুসম বানিয়ে নেয়, তখন দেখুন পীর–মুরীদীর কী অবস্থা হয় যায়। মহব্বত তো দূরের কথা, এখন তো অবস্থা এমন হয়ে গেছে যে, যেই স্থানে পীর সাহেব হাযির হলেন, সেখানকার মুরীদরা লুকিয়ে পড়তে থাকে, যেন এমন না হয় যে, কিছু দিতেই হয়। দু'আ চাইতে হয়, যেন কোনভাবে পীর সাহেব দ্রুত চলে যান। এখন বলুন ! পীরকে হাদিয়া দেওয়ার দ্বারা, পীরের খেদমত করার দ্বারা যেখানে আন্তরিকতা বৃদ্ধি পেত, সেখানে উল্টা আরো বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হলো। এটা কী কারণে হলো? হলো শুধু এই রুসম ও প্রথার কারণে।

আমার এক দোস্তের ঘটনা। তিনি দীর্ঘ একটি মেয়াদ পর্যন্ত হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)এর কাছে চিঠি পাঠাননি। আমি তার কাছে কারণ

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাব দিলেন, এতদিন আমি শূন্যহাত ছিলাম। চিন্তায় আছি কিছু টাকা-পয়সা কোথাও থেকে জুটে গেলে চিঠি লিখবো। আমি বললাম—এই ভাবনায় পড়বে না। বরং এখন তুমি অবশ্যই হাদিয়া ব্যতীতই চিঠি পাঠাও। এখন লক্ষ্য করুন! একটি দীর্ঘ মেয়াদ পর্যন্ত এই ভাবনা তাকে উপকৃত হওয়া থেকে বিরত রেখেছে। পীরকে হাদিয়া দেওয়া যদিও ভালো কাজ, কিন্তু রুসম করে নেওয়ার দ্বারা তাতে অসিদ্ধতা চলে এসেছে।

ঈদের দিনে পাঠানো হাদিয়া মূলত ঋণস্বরূপ দেওয়া হয়ে থাকে

এমনই একটি রুসম হলো ঈদের দিনের হাদিয়া। এ বিষয়ে যদি গভীরভাবে ভেবে দেখে, তাহলে লোকে জানতে পারবে যে, এটা ঋণস্বরূপ দেওয়া হচ্ছে। কেননা দেওয়ার সময় এই নিয়ত অবশ্যই থাকে যে, তাদের ওখান থেকেও আসবে। যদি কোনবার বিপরীত দিক থেকে না আসে তখন এদিক থেকেও বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং এটা হাদিয়া থাকলো না, এটা হয়ে গেলো ঋণ। অতএব ঋণগ্রস্ত হয়ে কিংবা ঋণগ্রস্ত বানিয়ে কী লাভ? মোটকথা এই যে, যেই যেই কাজে অসিদ্ধতা বা খারাবী রয়েছে, সেইসব কিছু থেকেই বেঁচে থাকা উচিত। কোন কাজে সামান্য সৌন্দর্য দেখে তা করে ফেলা এবং তার সমূহ অসিদ্ধতা ও খারাবীর প্রতি দৃষ্টি না দেওয়া মারাত্মক নির্বুদ্ধিতা। এখন ওয়ায শেষ করছি।

গোটা ওয়াযের নির্যাস

গোটা ওয়াযের নির্যাস যা হয়, তা পুনরাবৃত্তি করে বলছি যে, রোযা রেখেছে কিন্তু পেট ভরেছে হারাম দিয়ে আর দিনে গীবত ইত্যাদির মাঝে আবদ্ধ হয়ে থেকেছে, তাহলে এই রোযা কোন্ কাজের হয়েছে? মোদ্দাকথা হলো যে, রোযার যেসব আদব রয়েছে, যেসব হক রয়েছে, সেগুলোকে শিখে নিন এবং মহিলাদেরকেও শিক্ষা দিন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন—বহু রোযাদার এবং রাতে নফল আদায়কারী এমন রয়েছে, যাদের ক্ষুধা ও পিপাসার কোন প্রয়োজন নেই

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

আল্লাহ তাআলার। আর যদি যেমন রোযা রাখা উচিত, তেমনই রোযা কেউ রাখে, তাহলে তার সম্পর্কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন—রোযা এবং নামায উভয়টাই শাফাআত করবে। আযাব থেকে বাঁচানোর জন্য তার সঙ্গে থাকবে দু'জন ফেরেশতা। অতএব আপনারা বুঝতে পারছেন, যার জন্য দু'জন 'সরকারী প্রহরী' নিয়োজিত থাকবে, তার মুক্তি কিভাবে হবে না? আল্লাহ তাআলা আমলের তাওফীক দান করুন। আমীন!

শেষ দশদিনের আহকাম

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نومن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا من يهد ه الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادى له و نشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له و نشهدان سيدنا و مولنا محمدا عبده و رسوله صلى الله تعالى عليه و على اله واصحابه و بارك و سلم - اما بعد-

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم- بسم الله الرحمن الرحيم -

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ-

[তরজমা ঃ রমযান শরীফ এমন একটি মাস, যার মাঝে কুরআন শরীফ অবতীর্ণ করা হয়েছে, যা মানুষের জন্য হেদায়াত স্বরূপ এবং হেদায়াতের দলীল স্বরূপ এবং যা হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী।]

রমযান শরীফের দশদিনের মহত্ব

ইহা একখানা আয়াতের খণ্ডিত অংশ। এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা রমযানের একটি সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন। আগের জুমায় রমযানের অবশ্য পালনীয় হকসমূহের কথা বয়ান করা হয়ে গেছে। আজকের ওয়াযে শুধু শেষ দশদিনের নানা অবস্থা ও বিধি-বিধান নিয়েই আলোচনা হবে। বাহ্যত যদিও শেষ দশদিনের সাথে এই আয়াতের কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু চিন্তা-ভাবনা করার দ্বারা জানা হয়ে যাবে যে, এই

আয়াতে যেই সৌন্দর্যের কথা বর্ণিত হয়েছে, সেই সৌন্দর্য মূলত এই দশদিনেরই। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন—রমযান মাস এমনই মুবারক মাস যে, তার মাঝে আমি পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছি। অবশ্য এই আয়াত দ্বারা শুধু এতটুকুই জানা যায় যে, রমযানে কুরআন শরীফ অবতীর্ণ করা হয়েছে। তবে, এটা স্পষ্ট যে, রমযান হলো ত্রিশদিনের নাম ; আর এই আয়াতের দ্বারা একথা বুঝা যায় না যে, এই ত্রিশদিনের কোন্ অংশে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু আমরা যদি এই আয়াতের সাথে অন্য আয়াতকেও মিলিয়ে নেই, তাহলে উভয় আয়াতকে মিলানোর দ্বারা সেই অংশটি সম্পর্কেও জানা হয়ে যাবে, যেই অংশে কুরআন শরীফ অবতীর্ণ করা হয়েছে।

অন্য আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে—আমি উহা শবে কদরে নাযিল করেছি। এই দুই আয়াত দ্বারা জানা গেলো যে, কুরআন শরীফ রমযান মাসের শবে কদরে নাযিল করা হয়েছে। আর এ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ দ্বারা জানা যায় যে, শবে কদর হয়ে থাকে রমযানের শেষ দশ দিনে। সে হিসাবে জানা গেলো—কুরআন শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে শেষ দশ দিনে। অতএব আয়াতের দ্বারা শেষ দশ দিনের অনেক বড় এই সৌন্দর্যটি জানা গেলো যে, তার মাঝে কুরআন শরীফ অবতীর্ণ করা হয়েছে। কেননা কুরআন শরীফের অনেক বড় মর্যাদা রয়েছে। এজন্য যেই সময়ে সেই কুরআন শরীফ অবতীর্ণ করা হয়েছে, সেই সময়টিও হবে মুবারক সময়। কোন প্রেমিকের হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করুন, যেই সময়ে সে তার প্রেমাস্পদের কোন চিঠি পেয়ে থাকে, সেই সময়টি তার কাছে কী পরিমাণ প্রিয় হয়ে থাকে ! কুরআন শরীফ আল্লাহর কালাম আর আল্লাহ তাআলা হলেন প্রকৃত প্রেমাস্পদ। সুতরাং যেই সময়ে প্রকৃত প্রেমাস্পদের কালাম নাযিল হয়েছে, সেই সময়টি কেন আশেকদের কাছে প্রিয় এবং মুবারক হবে না ? যেদিন কোন বড় জিনিস পাওয়া যায়, সেই দিনটিও প্রিয় হয়ে থাকে। আর যদি গভীরভাবে ভেবে দেখা হয় তাহলে জানা যাবে—যেই যমানাতেই কোন সম্মান ও বরকত থাকুক, সেটা এ কারণেই যে, সেই যমানায় কোন সম্মান ও মর্যাদার বস্তু বিদ্যমান থাকে। এ কারণেই জুমার দিন অন্য সকল দিনের তুলনায় মর্যাদাপূর্ণ। কেননা

এই দিনে এমন একটি সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ জিনিস বিদ্যমান, যা অন্য কোন দিনে নেই অর্থাৎ জুমার নামায। দেখুন! যদি কূপের মধ্যেও প্রেমাস্পদের সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয় কোন প্রেমিকের, তাহলে প্রেমিক সেই কূপকে কূপ মনে করবে না; বরং তার অন্তরে সেই কূপের কদর এতটাই জন্মাবে, যে কদর ফুলে-পুষ্পে ভরা বাগানের ক্ষেত্রেও তার আসবে না।

জুমার দিনের মর্যাদার প্রতি আপত্তি এবং তার জবাব

অধিকাংশ মানুষ জুমার ফযীলত ও সৌন্দর্যের ওপর আপত্তি উত্থাপন করে এবং বলে থাকে এর কী কারণ যে, শুক্রবারের যে মর্যাদা রয়েছে, বৃহস্পতিবারের সে মর্যাদা নেই? যেই বার ঘন্টা শুক্রবারে রয়েছে, সেই বার ঘন্টাই তো বৃহস্পতিবারেও রয়েছে, বৃহস্পতিবার যেমন একটি দিন, শুক্রবারও তো তেমনি একটি দিন? এটা কী পরিমাণ বেহুদা প্রশ্ন ও অর্থহীন আপত্তি। কেননা বাহ্যত যদিও দিন উভয়টাই একই রকম হয়ে থাকে, তথাপি এটা কি জরুরী যে, মর্যাদার দিক থেকেও উভয় দিন সমান হবে? এটা কি জরুরী যে, একটির অবস্থা যাই হবে, অপরটির অবস্থাও তাই হবে? দেখুন! যদি কোন ব্যক্তির বোন এবং বিবি হুবহু একই চেহারার হয় এবং উভয়েই একই রকম পোশাক ও অলংকার পরিধান করে, তাহলে কি এই দুইজনের মাঝে হালাল-হারামের পার্থক্য থাকবে না? কোন বুদ্ধিধর ব্যক্তি এমন আছে কি, যে এই দুইজনকে একই রকম মনে করে এবং তাদের সাথে একই ধরনের ব্যবহার করে? সেই ব্যক্তির অন্তরে কি দুজনের প্রতি ভালবাসার ক্ষেত্রে অনেক বড় পার্থক্য থাকবে না? বোন এবং মা-ও প্রিয়, বিবিও প্রিয়। কিন্তু উভয়পক্ষের প্রতি ভালবাসা সম্পূর্ণই ভিন্ন।

মায়ের সাথে সহবাস করার স্বপ্ন এবং তার তা'বীর

কখনো কোন ব্যক্তিকে দেখা যায়নি যে, সে বিবির মত মাকেও পিয়ার করছে এবং মাকেও নিজের বাহুবন্ধনে গ্রহণ করার আকাঙ্খা পোষণ করছে। বরং এ ধরনের কল্পনার প্রতিও মানুষের এ পরিমাণ ঘৃণা আসে যে, যদি কেউ স্বপ্নেও মায়ের সাথে নিজেকে সহবাস করতে দেখে ফেলে, তাহলে জাগ্রত হয়ে সীমাহীন পেরেশান হয়ে যায় এবং নিজেকে গালমন্দ ও অভিশাপ করতে থাকে। অথচ এই স্বপ্নের তা'বীর বা ব্যাখ্যা মন্দ নয়। কেননা এই স্বপ্নের একটি তা'বীর হলো এই যে, সেই ব্যক্তির মাঝে সামান্যতমও অহংকার নেই এবং সে নিজে নিজেকে কিছুই মনে করে না।

জাহেল মানুষের কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করবেন না

এক বুযুর্গের কাছে কোন এক ব্যক্তি এমন স্বপ্ন বর্ণনা করার পর তিনি এই তা'বীরই করেছেন। যদি কোন জাহেল ব্যক্তির কাছে এমন স্বপ্ন বয়ান করা হয় তাহলে জানা নেই, সে কী তা'বীর দিয়ে বসে। এ কারণেই হাদীসে এসেছে যে, জাহেল ব্যক্তির কাছে নিজের স্বপ্ন বর্ণনা করবে না। বরং কোন জ্ঞানী–বিচক্ষণ ব্যক্তি কিংবা বন্ধুর কাছে বর্ণনা করবে। কেননা জ্ঞানী–বিচক্ষণ ব্যক্তি প্রকৃত তা'বীর বুঝে তোমাকে জানিয়ে দিবে। আর তোমার বন্ধু তা'বীর না জানলেও চুপ করে থাকবে, উল্টা–পাল্টা ব্যাখ্যা করে দিবে না। কিন্তু অপর লোক যে জ্ঞানী–বিচক্ষণও নয়, খোদাই জানেন সে কী বলে বসে! যাইহোক বুঝা গেলো যে, এই স্বপ্নের তা'বীর ভালো। কিন্তু তারপরও কেউ যদি এমন স্বপ্ন দেখে ফেলে তাহলে সে ভীষণ পেরেশান এবং হীনমন্যতাগ্রস্ত হয়ে যায়। এর দ্বারা বুঝা গেলো, মায়ের প্রতি যে ভালবাসা, তা এক ধরনের আর বিবির প্রতি যে ভালবাসা তা আরেক ধরনের। উভয় ভালবাসা একই ধরনের নয়। অতএব স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, শুক্রবার এবং বৃহস্পতিবার বাহ্যত একই

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

রকম হওয়ার দ্বারা এটা অপরিহার্য হয়ে যায় না যে, মর্যাদার দিক থেকেও উভয়ে সমান হবে।

কুরআন শরীফের মর্যাদার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, উহা আল্লাহ পাকের কালাম

অতএব যেহেতু রমযান মাসে কুরআন শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং কুরআন নিজেই অনেক সম্মান ও মর্যাদা ধারণ করে, তাই কুরআন নাযিল হওয়ার সময়টি ও সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ হয়ে গেছে। বন্ধুগণ! এটা কেমন কথা যে, দুনিয়ার প্রেমাস্পদের সাথে কথাবার্তা বলার সময়টা আনন্দময় এবং প্রিয় হবে আর প্রকৃত প্রেমাস্পদের কালাম অবতীর্ণ হওয়ার সময়টা প্রিয় হবে না? এটা কিভাবে হতে পারে? যদি স্বয়ং কালামে পাকের নিজস্ব গুণ–বৈশিষ্ট্যসমূহকে দেখা না–ও হয়, তথাপি তার জন্য এই মর্যাদা ও সম্মানই বা কম কিসের যে, উহা আল্লাহ পাকের কালাম। এরপর এটাও দেখুন––এই সূর্য আপনাদের অন্তরসমূহকে কী পরিমাণ আলোকিত করে রেখেছে।

কুরআন শরীফ পড়ার দ্বারা আল্লাহ পাক যতটুকু সন্তুষ্ট হন, অন্য কিছু পড়ার দ্বারা ততটুকু হন না

যেহেতু কুরআন শরীফের সাথে আল্লাহ তাআলার বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে, তাই কালামে মজীদ পাঠ করার দ্বারা তিনি খুশী হন ; চাই বুঝে পড়া হোক অথবা না বুঝেই পড়া হোক। কিন্তু অন্য যত আমল রয়েছে, সে সবের মাঝে এই সৌন্দর্য নেই। কেউ যদি দুআ অথবা অন্য কোন ওযীফা পড়ে এবং তার অর্থ না বুঝে থাকে তাহলে তা এ পরিমাণ পছন্দনীয় নয়। কিন্তু কুরআন এমনই বিস্ময়কর মহান গ্রন্থ সব ভাবেই তা প্রিয় ও পছন্দনীয় ; চাই তার অর্থ বুঝে থাকুন অথবা না বুঝে থাকুন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)এর ঘটনা। তিনি আল্লাহকে স্বপ্নে দেখলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কোন্ জিনিস দ্বারা সবচেয়ে বেশী রাজী–খুশী হন?

এরশাদ হলো—কুরআন শরীফ পড়ার দ্বারা।

ইমাম সাহেব আরয করলেন—অর্থ বুঝে পড়লে, নাকি না বুঝে পড়লেও ?

উত্তরে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করলেন—بفهم او بلا فهم

অর্থাৎ, যেভাবেই পড়া হোক। আর একথা শুধু স্বপ্নের দ্বারাই জানা যায়নি, বরং হাদীস দ্বারাও একথাই জানা যায়।

হাদীসে এসেছে—প্রতি হরফে দশটি করে নেকী পাওয়া যায়।

কুরআন শরীফ অর্থ না বুঝে পড়ার বিষয়ে আধুনিক চিন্তা মানুষের প্রশ্ন এবং তার জবাব

এই আলোচনার দ্বারা আজকালের আধুনিক চিন্তাধারার লোকদের ভুলটিও জানা হয়ে গেলো। এদের অধিকাংশই প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, আল্লাহর কালামকে যখন বুঝা যায় না, তখন তা পড়ার দ্বারা কী ফায়দা ? এখন তাদের হয়তো জানা হয়ে গেছে যে, কালামে মজীদ না বুঝে পড়াও বহু ফায়দা ও উপকার বহন করে। কারণ এর ফায়দা তো শুধু এটা নয় যে, তার অর্থ বুঝে নিবে, বরং একটি বড় ফায়দা এটাও যে, উহা পড়ার দ্বারা আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি রাযী হয়ে যাবেন, বয়ানে সেটা বলা হয়েছে। আর এ বিষয়টি বুদ্ধি-বিবেচনা ও স্বভাব-রীতি দ্বারাও জানা যায়। দেখুন ! যদি কেউ কোন কিতাব রচনা করে এবং অন্যদেরকে দেখে যে, তার কিতাবটি পড়ছে, তাহলে এ দৃশ্য দেখে সে ভীষণ আনন্দিত হবে ; চাই পাঠকবর্গ সেই কিতাবটি বুঝতে না পারুক। সেই পাঠকবর্গের সাথে তার মহব্বত হয়ে যাবে এ কারণে যে, এই লোকেরা তার কিতাবটির কদর করেছে।

আমাদের মুর্শিদ হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব (রহঃ) এরশাদ করেছেন, আমি একবার দিল্লী বাজার অতিক্রম করছিলাম। একটি দোকানে বহু লোককে একত্রিত অবস্থায় দেখলাম। এরপর তিনি দেখেন, তাদের মাঝে এক ব্যক্তি বসে হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব (রহঃ)এর একটি শে'রের কিতাব যার নাম হলো 'দরদনামায়ে গমনাক' [দুঃখীজনের বেদনাগাঁথা] খুব মনোযোগের সাথে পাঠ করছে। হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)ও দাঁড়িয়ে শুনছিলেন এবং দিলে দিলে খুশী হচ্ছিলেন যে, লোকে

আমার কথাগুলো পড়ছে। সেই লোকটি জানতওনা যে, যে ব্যক্তির কিতাব পড়ছে, তিনিও তা শুনছেন। অথচ তিনি তো তাদের কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন এবং খুশী হচ্ছিলেন। একইভাবে যখন আল্লাহর কালামকে আমরা আগ্রহের সাথে পাঠ করবো এবং আল্লাহ তাআলা তা শুনবেন তখন অবশ্যই খুশী হবেন। কেননা আল্লাহ তাআলা আর কোন ইবাদতের কারণে এ পরিমাণ খুশী হন না, যে পরিমাণ খুশী হন কুরআন শরীফ পড়ার দ্বারা। আর আল্লাহ তাআলার শ্রবণ করার বিষয়টি সুনিশ্চিত। কেননা আল্লাহ তাআলার কাছে আকাশ–যমীনের কোন কিছুই অদৃশ্য ও গায়েব থাকতে পারে না এবং অণু পরিমাণ বস্তুও তাঁর কাছে গোপন থাকতে পারে না। বিষয়টি যেমনই হোক, তার পূর্ণ সংবাদ আল্লাহ তাআলা রাখেন। অতএব চাই বুঝে পড়ুন অথবা না বুঝেই পড়ুন, তিনি সবভাবেই খুশী হবেন।

নফসের এছলাহের সময় মাখলুকের দিকে একদম মনোযোগ দিতে নেই এবং এরই একটি আশ্চর্য কাহিনী

এক বুযুর্গের এই কাহিনীটি মশহুর হয়ে আছে যে, তিনি তাঁর এক মুরীদকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত ওযীফা পড়াচ্ছিলেন। যখন কোন ফায়দা হতো না, তখন আবার পাল্টিয়ে দিতেন। কিন্তু এভাবে শেষ পর্যন্ত যখন মুরীদের কোন উপকারই হলো না তখন তিনি মুরীদকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি ওযীফা কোন্ নিয়তে পড়? মুরীদ জবাব দিলো, হযরত! এই নিয়তে পড়ি যে, যদি কোন যোগ্যতা এসে যায়, তাহলে অন্যদের উপকার করবো। সেই বুযুর্গ বললেন—তওবা করো। এটা তো শিরক যে, এখন থেকেই বড় সাজার সখ এবং মাখলুকের দিকে নযর ; প্রতি মুহূর্তেই অন্যকে উপকৃত করার কল্পনা। নিজের ধ্যান শুধু আল্লাহ তাআলার দিকে নিবদ্ধ রাখো।' অতঃপর যখন মুরীদ তওবা করলো, সঙ্গে সঙ্গেই ফায়দা হলো। মোটকথা যখন নিজের অবস্থা শোধরানোর পালা, তখন মাখলুকের দিকে ধ্যান রাখলে ক্ষতি সাধিত হয়।

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

কামেল পীর মুরীদকে নিরাশ করে না বরং তার চিকিৎসা করে

এই কাহিনীর দ্বারা এই বিষয়টিও বুঝা যায় যে, যেই পীরের মাঝে কিছু যোগ্যতা পূর্ণতা ও কামাল থাকে, তিনি মুরীদকে নিরাশ করে দেন না ; যেমন বর্ণিত বুযুর্গ ওযীফা বদল করে দিচ্ছিলেন এবং উপকার না হওয়ার কারণে মুরীদকে ফিরিয়ে দেননি। বরং এই চেষ্টাতেই নিমগ্ন ছিলেন। শেষ পর্যন্ত রোগ এবং তার চিকিৎসা বাহির করেই নিয়েছেন। কামেল পীর অভিজ্ঞ ডাক্তারের মত চিন্তা-গবেষণা ও অনুসন্ধানে সবসময় লেগে থাকেন। তবে যেই পীর কামেল হয় না, সে এই পরিস্থিতিতে হাল ছেড়ে দেয় এবং অন্যদেরকেও নিরাশ করে দেয়।

আল্লাহ পাকের মহব্বত সব মহব্বতের ওপর প্রবল হওয়া চাই

হযরত ইবরাহীম আদহাম (রহঃ)এর এই ঘটনাটি প্রসিদ্ধ যে, তার ছেলের নাম ছিলো শেখ মাহমূদ (রহঃ)। যখন তিনি তাঁর ছেলের সাথে সাক্ষাত করলেন, তখন ছেলের ভালবাসা তাঁর অন্তরে উথলে উঠলো। আর সঙ্গে সঙ্গেই গায়েব থেকে আওয়ায আসলো—

حب حق دل میں یا حب پسر – جمع ان دونوں کو تو ہرگز نہ کر

অর্থাৎ হয় আমার ভালবাসা অন্তরে পোষণ করো অথবা ছেলের, উভয়টা একত্রিত হতে পারবে না।' অতঃপর তৎক্ষণাৎ তাঁর হুঁশ চলে এলো এবং আল্লাহ পাকের মহব্বতকেই কবুল করে নিলেন। তারপর ছেলের ইন্তেকাল হয়ে গেলো। তবে, এ ঘটনার দ্বারা এমন না বুঝা চাই যে, ছেলের প্রতি সামান্য ভালবাসাও পোষণ করা যাবে না। না, এমন নয়, বরং শরীয়তের আলোকে যতটুকু তার হক, তাকে ততটুকু ভালবাসা সুন্নত। অবশ্য সে ভালবাসা এ পরিমাণ না হওয়া চাই যে, তা আল্লাহ পাকের ভালবাসার উপর গালেব হয়ে যায়, প্রবল হয়ে যায়। সে হিসেবে পীরের সাথেও এমন মহব্বত না হওয়া চাই, যা আল্লাহকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত করে দেয় ; যেমন আজকাল বহু সাধারণ লোকজনের মাঝে

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

প্রচলিত। একইভাবে স্ত্রী–সন্তানের প্রতি এমন ভালবাসা না থাকা চাই, যার ফলে আল্লাহ্ তাআলার মহব্বতের মাঝে হ্রাস ঘটে যায়। দেখুন! আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেন—

‘তোমাদের ধনসম্পদ এবং সন্তান–সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে বিরত না রাখে।’

আল্লাহ্ তাআলার এই মেহেরবানী ও দয়ার প্রতি উৎসর্গীত হয়ে যাওয়া উচিত যে, তিনি এই আদেশ দেননি যে, সন্তানের প্রতি সামান্য ভালবাসাও পোষণ করবে না। কেননা তিনি জানেন সন্তানের ভালবাসায় তাদের অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে আছে, এজন্যই তারা এ ভালবাসা সম্পূর্ণ ছাড়তে পারবে না। এ কারণেই তিনি এই এরশাদ করেছেন যে, তোমরা তাদের পিছনে এতটা ছুটবে না যে, আল্লাহ্‌কেই ভুলে যেতে হয়।

লোকজন কুরআন শরীফের সাহায্যে দুনিয়া কামানো শুরু করেছে

এখন আপনারা জেনে গিয়েছেন কুরআন শরীফ পড়ার মাঝে কত সওয়াব! আফসোস হলো, এমন বিরাট সওয়াব ছেড়ে দিয়ে নফসের দাসেরা কুরআন শরীফের সাহায্যে দুনিয়া কামানো শুরু করে দিয়েছে। অর্থ গ্রহণ, পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে কুরআন শরীফ শুনিয়ে থাকে, যেমন তারাবীহর মাঝে অধিকাংশ জায়গাতেই এর প্রচলন হয়ে গেছে। এমনিভাবে কুরআন শরীফ পড়ে মুর্দাদেরকে যেই সওয়াব পৌছানো হয় এবং তার ওপর টাকা পয়সা গ্রহণ করা হয়, এটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

কুরআন শরীফ যতবাই পড়ুন প্রতিবারই নতুন স্বাদ পাবেন

এবং এই কালামের এমন শান যে, তা যত অধিক পড়বেন, ততই এলম বাড়বে। তাছাড়া মজার ব্যাপার এটাই যে, জাহেলরাও কুরআন থেকে স্বাদ পায়। হাদীস শরীফে আছে যে, কুরআন শরীফ বারবার পড়ার দ্বারা পুরাতন হয় না। বাস্তবেই কুরআন শরীফ যতই শুনুন, মন ভরে না। প্রতিবারই নতুন স্বাদ পাওয়া যায়। যদি বলা হয় যে, হয়তো এই সকল

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

স্বাদ সুন্দর আওয়াযের কারণেই হয়ে থাকে তাহলে আমরা বলবো—যে মজা ও স্বাদ কুরআন পড়ার দ্বারা পাওয়া যায়, শে'র পড়ার দ্বারা কেন পাওয়া যায় না? আর যদি শে'রের মাঝেই কেউ স্বাদ বেশী পায়, তাহলে সে এখনো আলোচনার যোগ্যই হয়নি। তার উচিত প্রথমে নিজের অবস্থা শোধরানো। এরপর সে দেখুক—মজা কোথায় বেশী পাওয়া যায়।

বন্ধুগণ! কুরআনের কথা তো আছেই, কখনো মক্কায় গিয়ে সেখানকার নামাযের তাকবীরগুলো শুনলে বুঝবেন তা কী জিনিস! সত্য সত্যই তখন সেইসব তাকবীরগুলোকে এমন অনুভব হয় যে, যেন যবেহর সময়ের তাকবীর ; যেন তা ছুরির মত হৃদয়ে দাগ কেটে চলেছে। তবে, কারো যদি মজা না-ও লাগে, সেও যেন কুরআন শরীফ পড়া না ছেড়ে দেয়।

সাধারণ মানুষের এই ধারণা ভুল যে, যখন স্বাদ লাগবে, তখনই কুরআন শরীফ পড়বো এবং এ বিষয়ে উত্তম উদাহরণ

কোন কোন লোক যেমন বলে—আরে সাহেব! আমরা তখনই কুরআন শরীফ পড়বো, যখন স্বাদ পেতে শুরু করবো। এটি সম্পূর্ণ বাজে চিন্তা। এর উদাহরণ তো এমন যে, কোন পুরুষত্বহীন ব্যক্তিকে যখন বলা হয় যে, শক্তির উপাদান খেয়ে-দেয়ে দ্রুত জওয়ান হয়ে উঠো, যেন তোমার যৌবনের স্বাদ লাভের সৌভাগ্য হয়, তখন সে উত্তরে এই কথা বলে যে, সাহেব! প্রথমে যৌবনের মজা দেখে নেই—কেমন হয়, তারপর তার তদবীর করবো। বলুন! এই নির্বোধকে পুরুষত্বহীন অবস্থায় চিকিৎসা গ্রহন ব্যতীত কিভাবে সেই মজা দেখানো যাবে?

এর জবাব তো শুধু এটাই দেওয়া যেতে পারে যে, আচ্ছা ভাই! চিকিৎসা করো না, যখন বিনা চিকিৎসায় তুমি যুবক হয়ে উঠবে, তখন খোদ তুমিই তার মজা বুঝতে পারবে। অন্য আর কোন উপায় নেই, যার দ্বারা যৌবনের আগে যৌবনের মজা বুঝে নিতে পারবে।

একইভাবে সেই লোকদেরকে এই উত্তর দেওয়া যায় যে, কুরআন শরীফের স্বাদ তখনই নসীব হবে, যখন হিম্মত করে পড়তে শুরু করবে। তখন তুমি নিজে নিজেই তার মাঝে স্বাদ পেতে থাকবে। এই ভুলটিই

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

অধিকাংশ সময় এমন লোকজনের বেলাতেও ঘটে থাকে, যারা ইতোমধ্যেই আল্লাহর নাম নিতে শুরু করেছে। তারা যখন স্বাদ পায় না, তখন ছেড়ে দিয়ে বসে থাকে। অথচ এটা অত্যন্ত মারাত্মক ভুল। কেননা স্বাদ তো এভাবেই আসতে পারে যে, আপনি ভালোভাবে অভ্যাস করুন এবং অনেক বেশী করে আল্লাহ তাআলার যিকির করতে থাকুন। আল্লাহ পাকের নাম যতবেশী নেওয়া হবে, ততই স্বাদ বেড়ে যাবে।

এক বুযুর্গের আল্লাহকে তলব করার কাহিনী

এক বুযুর্গের ঘটনা। তাঁর কাছে একদিন এই আওয়ায এলো, যতই ইবাদত কর, কিছুই কবুল হবে না। এই আওয়াযটি তার এক মুরীদও শুনে ফেললো। দ্বিতীয় দিন আসলো। সেই বুযুর্গ পুনরায় ইবাদতের জন্য উঠলেন। আবারো সেই আওয়ায এলো। যখন কয়েকবার এমন ঘটলো, তখন মুরীদ বললো, আপনিও এক আজব মানুষ। ওদিকে কোন সাড়া–শব্দই নেই আর আপনি খামাখাই পড়ে থাকছেন। যখন কবুলই হবে না তখন মেহনত করে কী লাভ? সেই বুযুর্গ উত্তরে বললেন—ভাই ছেড়ে যে দিবো, ছেড়ে দিয়ে কোন্ দুয়ারে গিয়ে পড়বো? এই উত্তরে আল্লাহ পাকের রহমত উথলে উঠলো এবং আওয়ায আসলো, যদিও তোমার ইবাদত কোন মানের নয়, কিন্তু তারপরও যখন আমি ব্যতীত তোমার কেউ নেই তখন তোমাকে আমিই গ্রহণ করে নিবো।

বন্ধুগণ! হকের প্রতি যার তলব থাকে, সত্যের প্রতি যার অন্বেষা থাকে, তার শান এমনই হয়। আফসোস! লোকজনের মাঝে আল্লাহর তলব এতটুকুও নেই, যতটুকু তলব রয়েছে পরশ পাথরের। এর পিছনে তো মানুষ বছরের পর বছর ধরে দেয়, ধনসম্পদ বিনাশ করে ফেলে, আরাম–আয়েশকে ধূলায় মিশিয়ে দেয়। অথচ আল্লাহ তাআলার তলবে সামান্য কষ্টও স্বীকার করতে চায় না।

সেই ব্যক্তিই অন্বেষণকারী, সাক্ষাতের ব্যাপারে যে নিরাশ হয় না এবং আশ্চর্য একটি কাহিনী

আরে ভাই! অন্বেষণকারী বা তলবগারের অবস্থা তো এমন হওয়া চাই যে, যদি হাজার বারও তাকে বলা হয় যে, তুমি দোযখী তথাপি

কখনো সে নিরাশ হয় না। আর যদি হাজার বার তাকে বলা হয়—তুমি জান্নাতী তবুও কিছুতেই সে উদাস ও অলস হয়ে যায় না। এক ব্যক্তি সম্পর্কে লেখা হয়েছে, প্রতিদিন তার কাছে এই আওয়ায আসতো যে, তুমি কাফের হয়ে মারা যাবে। যখন দীর্ঘ একটি সময় পর্যন্ত এই আওয়ায আসলো, তখন সে তার পীরের কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলো। পীর সাহেব বললেন—এটা মহব্বতের গালি। প্রেমাস্পদদের এই স্বভাব থাকে যে, আশেককে তারা উৎপীড়ন করে থাকে। এ এক প্রকার পরীক্ষা। কিন্তু এইসব বিষয় তখনই বরদাশত হয়, যখন আল্লাহর মহব্বত অন্তরে পরিপূর্ণভাবে বিরাজ করে। সুতরাং আল্লাহ পাকের মহব্বত সৃষ্টি করার চেষ্টা করুন। এর উপায় ও তদবীর দুটি। একটি হলো, আল্লাহ তাআলার যিকির বেশী বেশী করা চাই আর দ্বিতীয়টি হলো, বুযুর্গদের সংশ্রবে অধিক উঠাবসা রাখবেন। এই তদবীর অবলম্বন করলে দিলের রোগ-ব্যাধি ধীরে ধীরে চলে যাবে।

আল্লাহর পথে যে ব্যক্তি চলতে চায়
তার জরুরী কর্মসূচী

এই বয়ান দ্বারা জানা গেলো, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহকে পাওয়ার পথ তালাশ করে এবং সেই পথে চলতে শুরু করে তবে তার জন্য সঙ্গত হলো এমন ব্যক্তিকে সন্ধান করা, যে আল্লাহ তাআলার মহব্বতে নিমজ্জিত আছে। বাস তার দরজায় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন জিনিসের অন্বেষণকারী হবেন না। কারামাতই যেন লক্ষ্য না হয়, মকসুদ যেন না হয়, ভূত-ভবিষ্যত এবং গুপ্ত বিষয়কে অবহিত হওয়া, যাকে আজকাল লোকে কাশ্‌ফ বলে। নযর যেন এদিকে না থাকে যে, আমার মজাদার হাল নসীব হয়ে যাক ইত্যাদি ইত্যাদি। শুধু আল্লাহই হওয়া চাই আপনার উদ্দেশ্য। যদি আপনা আপনি অন্য জিনিসগুলোও এসে যায় তাহলে আল্লাহ তাআলার দান মনে করুন। না আসলে কোন চিন্তা করবেন না। ইবাদতে স্বাদ না পেলে তাকে ছাড়বেন না। অধিক পরিমাণে আল্লাহ পাকের যিকির করুন এবং খুব বেশী করে তাঁর ইয়াদে লেগে থাকুন। একই ভাবে কুরআনের মাঝে যদি তবীয়ত অনাগ্রহী না হয়, তাহলে খুব

বেশী বেশী কুরআন শরীফ পড়ুন। অধিক পড়ার দ্বারা অন্তর খুবই লাগতে থাকবে। যদি হরফ ছহীহ না হয়, তবে যতটুকু আপনার দ্বারা সম্ভব, ছহীহ করে নিন এবং কোন ছহীহ পড়নেওয়ালার কাছ থেকে শিখে নিন। তারপরও যদি পরিপূর্ণভাবে ছহীহ না হয় তাহলে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না। আল্লাহ এ ভাবেই কবুল করে নিবেন। তবে, যেসব ব্যক্তি ছহীহ করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও ছহীহ করে না, নিঃসন্দেহে তাদের পাকড়াও করা হবে। অন্যথায়, আল্লাহর কাছে হৃদয়সমূহের দেখাশোনা, যাচাই–বাছাই বেশী হবে। যদি মোটা জিহ্বার গ্রাম্য মানুষ কুরআন শরীফ গলদ পড়ে, কিন্তু পড়ে অন্তর দিয়ে, তাহলে সেই ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার কাছে খুবই পছন্দনীয় হয়। অপরদিকে সেই ব্যক্তি তাঁর কাছে পছন্দনীয় নয়, যে ব্যক্তি সেই গ্রাম্য লোকের তুলনায় হাজার গুণ ভালো পড়ে, কিন্তু পড়ে দেখানোর জন্য এবং নিজের যোগ্যতা ও পূর্ণতা জাহির করার জন্য।

এ প্রসঙ্গে আমার একটি কাহিনী মনে পড়ে গেছে। লোকটি আমার সাথে সম্পর্ক রাখতো। একদিন আমাকে বলতে লাগলো—আমি কোন ফকীরের চেলা হয়ে যাবো। আমি তার ওপর রাগান্বিত হলাম। কিছুদিন পর সে আবার এলো। আমি তাকে রসিকতা করে জিজ্ঞাসা করলাম—কী—কোন ফকীরের চেলা হয়েছ নাকি এখনো হওনি? তখন সে অত্যন্ত সরলভাবে জবাব দিলো—বাস্ এখন তোমার দরজাই আঁকড়ে ধরেছি।' তার এই 'তোমার' বলাটা ছিল অন্যদের 'হুযূর–জনাব' বলা থেকে অনেক মজাদার। কেননা সে কথাটা বলেছে একদম অন্তর থেকে।

কোমলতা যেমন চিকিৎসা তেমনই কঠোরতাও চিকিৎসা

এ কথাও অনুধাবন করা চাই যে, কোমলতা যেমন চিকিৎসা, তেমনিভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে কঠোরতা তার চেয়েও বড় চিকিৎসা। এ কারণেই কোন কোন বুযুর্গ মশহুর হয়ে যান রাগী স্বভাবের মানুষরূপে। ভালোভাবে বুঝে নিন, তাঁরা আসলে স্বভাবে রাগী নন। ব্যাপার হলো এই যে, কখনো কোন কোন ব্যক্তি থাকে এমন যে, তাকে একটি কথা কোমল ও নরমভাবে বুঝালে তার ওপর বেশী একটা প্রভাব পড়ে না এবং

www.banglakitab.weebly.com

www.islamfind.wordpress.com

বেশী দিন মনেও থাকে না। আর এই কথাটিই তাকে কঠোরভাবে বুঝালে প্রভাবও অধিক হয় এবং মনেও থাকে বহুদিন পর্যন্ত। এই ব্যক্তিটিকেই যে কোন এক ফকীরের চেলা হতে চাচ্ছিলো দেখুন! একটি ধমকের প্রভাব তার উপর এমনভাবেই পড়েছে যে, তার চোখ খুলে গেছে এবং তার দোদুল্যমান স্বভ্যব একদিকে ঝুঁকে পড়েছে। মোটকথা, ভুলত্রুটি ধরিয়ে দেওয়া ; সেটা যেভাবেই সঙ্গত ও শোভন মনে হোক। এটা এ কারণে যে, এর চেয়ে অধিক কোন কিছুর ওপর মানুষের ক্ষমতা নেই। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা মনে পড়ে গেলো। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের যুগে এক রাখাল মাটিতে বসে মহব্বতের আবেগে ভরপুর হয়ে বলে যাচ্ছিলো—হে আল্লাহ! তুমি কোথায়? যদি আমি তোমাকে পাই, তাহলে তোমার কাজকর্ম করে দেবো, ফাই-ফরমায়েশ খাটবো, তোমার ছিঁড়ে যাওয়া কাপড় সেলাই করে দেবো, চিরুনি দিয়ে তোমার মাথা আঁচড়ে দেবো।

মোটকথা এ ধরনের কথাবার্তা আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে বলছিলো ; এই সময়েই হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাখালের কথা শুনে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—মিয়া! এই কথাগুলো কাকে বলছো? রাখাল জবাব দিলো—আল্লাহকে বলছি। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ধমক দিয়ে বললেন—তওবা করো, তওবা করো! আল্লাহ তাআলা এইসব বিষয় থেকে পবিত্র। ধমক দিয়ে তিনি চলে গেলেন। রাখাল যখন এই কথা শুনলো, তখন শংকায়-ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে গেলো। সে মুহূর্তেই হযরত মূসা (আঃ)এর ওপর এই ওহী আসলো যে, হে মূসা! তুমি আমার বান্দাকে আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছো।' হযরত মূসা (আঃ) এই ওহীর বাণী শুনে ভীত হলেন এবং দ্রুত রাখালের কাছে গিয়ে বললেন—ভাই! আমার দ্বারা ভুল হয়ে গেছে, আল্লাহর ওয়াস্তে মাফ করে দাও।' সেই রাখালের ছিলো আশ্চর্য অবস্থা। যখন মূসা (আঃ) মাফ করার কথা বললেন তখন রাখাল বললো—মূসা! আমার ওপর বেতের এমন আঘাত লেগেছে যে, আমি অনেক দূরে ছিটকে পড়েছি। এই ঘটনা দ্বারা বুঝা গেলো যে, অন্তর যদি মহব্বতে ভরপুর হয় এবং সম্পজ্ঞান ও বুদ্ধির কারণে যবানে অসঙ্গত

কথাবার্তা চলে আসে, তাহলে তার জন্য কোন পাকড়াও হয় না। তবে এটা অনিবার্য যে, এই ক্ষমা ও সুযোগ শুধু সেই ব্যক্তির জন্য, যে নিজের যবান ও ভাষাকে দুরস্ত করতে সক্ষম হয় না। অন্যথায় এক্ষেত্রে কারো সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যদি সে এমন করে, তাহলে অবশ্যই গুনাহগার হবে।

আলোচনা অনেক দূরে চলে গেছে। আসল উদ্দেশ্য এটা ছিলো যে, কুরআনের মাঝে যখন এমন মহত্ব রয়েছে, মর্যাদা রয়েছে, তখন সেই মাসে এই কুরআনকে অবতীর্ণ করা হয়েছে সেই মাসও এই সম্মান ও মর্যাদার ধারক হবে। বিশেষত রমযানের শেষ দশদিন যার মাঝে শবে কদর রয়েছে, তাও সীমাহীন সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ। এ কারণে যে, কুরআন পাক রমযানে বিশেষত এই দশদিনের মাঝেই অবতীর্ণ হয়েছে। বাকী থাকলো রমযানের প্রথম বিশ দিন। এই দশদিনের বদৌলতে সেই বিশদিনেরও সম্মান ও মর্যাদা নসীব হয়ে গেছে। এই শেষ দশদিনের একটি সৌন্দর্য তো এটি যে, কুরআন তার মাঝে নাযিল হয়েছে। দ্বিতীয় সৌন্দর্য হলো, হাদীস শরীফের মাধ্যমে জানা যায়, শবে কদরও হয়ে থাকে এই দশদিনের মাঝেই এবং অধিকাংশ সময় বেজোড় রাত্রে তা এসে থাকে। আল্লাহ পাক বলেন—শবে কদর হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। বন্ধুগণ ! ইহা এমনই এক বরকত ও সৌন্দর্যের বিষয় যে, যে ইহা থেকে মাহরুম থেকে যাবে, বুঝবে সে সকল কল্যাণ থেকেই মাহরুম ও বঞ্চিত থেকে গেলো।

শবে কদরের বরকত হাসিল করার তাকীদ

হাদীসে আছে—যে ব্যক্তি শবে কদর থেকে বেনসীব থেকে গেলো, সে সকল কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত থাকলো। কিন্তু কোন কোন লোক বিভ্রান্তির কারণে এমন বুঝে নিয়েছে যে, যদি জাগতে হয় তবে সারারাতই জাগতে হবে। আর সারারাত না জাগলে কোন ফায়দাই হবে না। এটা নেহায়েত বাজে চিন্তা। যদি কেউ সেই রাতের অধিকাংশ ভাগেও ইবাদত করে সে–ও শবে কদরের বরকত লাভ করতে পারবে। আমি বলি, যদি

সারারাতও জাগতে হয়, তবেই এমন আর কী সময় কাটলো! বন্ধুগণ! গোটা একটি বছর পার হওয়ার পর রমযান আসে। আপনারা হয়তো জানেন গত রমযানে এমন অনেক লোক ছিলো, যারা এখন দুনিয়াতে নেই। আমাদের কী জানা আছে যে, আগামী রমযান পর্যন্ত কার কার পালা চলে আসবে? এজন্যই এমন বড় সম্পদ লাভের জন্য যদি দু-এক রাত কেউ জেগেও কাটায়, তাহলেই এমন কী আর সময়ের ব্যাপার! যাই হোক যদি সারারাত জাগ্রত থাকার মনোবল না থাকে, তাহলে রাতের অধিক ভাগকে না ছাড়াই উচিত। আর উত্তম হলো, সেই অধিক ভাগ যেন শেষ রাতের হয়। কেননা প্রথমত সেসময় খাবার হজম হয়ে যায়। তবীয়ত হালকা হয়ে যায়। দুআয় খুব মন লাগে। দ্বিতীয়ত হাদীসে এসেছে—আল্লাহ তাআলা প্রতিদিন শেষ রাতে নিজের বান্দাদের প্রতি অনেক বড় রহমত বর্ষণ করে থাকেন এবং মেহেরবানীর সাথে তাদের দিকে তাওয়াজ্জুহ দেন। আরো একটি ব্যাপার হলো, শেষ রাতে শোরগোলও থাকে না। ইতমিনানের একটি হালত থাকে। এই অবস্থা শুধু শবে কদরের সাথেই নির্দিষ্ট নয় ; বরং প্রতিরাতেই শেষ ভাগে আল্লাহ পাকের রহমত ও মেহেরবানী হয়ে থাকে এবং তবীয়ত ও স্বাস্থ্যে থাকে প্রশান্তি। একজন সুন্দর বলেছেন ঃ

اے خواجه چه پرسی زشب قدر نشانے

هرشب شب قدراست اگر قدربدانے

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি প্রতিরাতের কদর জানবে না, সে শবে কদরকেও চিনবে না। কারণ হলো, শবে কদর হবে সেই রাতগুলোরই কোন একটি রাতে। তাই যে ব্যক্তি সকল রাতের কদর করবে, মূল্য দিবে সে শবে কদরকেও পেয়ে যাবে আর যে অন্যসকল রাতের অবমূল্যায়ন করে গাফলতির ঘুমে বিভোর থাকবে, সে তার এই অভ্যাসের কারণে শবে কদরকেও হাত থেকে হারিয়ে ফেলবে।

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

যে ব্যক্তি সারাবছর রাতে ইবাদত করবে সে অবশ্যই শবে কদর পাবে এবং এ বিষয়ক একটি আশ্চর্য কাহিনী

এ কারণেই কোন কোন বুযুর্গ বলেছেন—যে ব্যক্তি সারাবছর রাত্র জাগরণ করবে সে শবে কদরকেও পেয়ে যাবে। কেননা যখন সে বছরব্যাপী সমানভাবে রাত্রি জেগে ইবাদত করবে, তখন অবশ্যই শবে কদরেও ইবাদত হয়ে যাবে। কারণ শবে কদর সেই রাতগুলোরই কোন একটি রাত। বুস্তাঁতে লেখক সুন্দর একটি গল্প লিখেছেন–এক শাহযাদার একটি মহামূল্যবান মোতি একরাতে কোন জায়গায় পড়ে গেলো। শাহযাদা তখন নির্দেশ দিলো, সেই জায়গার সকল পাথরকণা উঠিয়ে একত্রিত করো। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে শাহযাদা বললো—যদি পাথর কণাগুলোকে বাছাই করে জমা করা হতো তাহলে হয়তো সেসবের মাঝে মোতি আসতো না। যখন সমস্ত পাথরকণা- গুলোকে উঠিয়ে আনা হয়েছে, তখন অবশ্যই মোতি তার মাঝে এসে গেছে।

কিন্তু এমন হিম্মতসম্পন্ন মানুষ বর্তমানে কোথায় যে, এই মূল্যবান মোতির তালাশে বছর ধরেই রাত্র জাগরণ করবে? কিন্তু রমযানের শেষ দশদিন তো অবশ্যই রাতে জাগ্রত থাকা এবং ইবাদত করা চাই। কেননা শবে কদর অধিকাংশ সময় সেই রাতগুলোতেই হয়ে থাকে। আর যদি কোন ব্যক্তি নিতান্তই কম শক্তি এবং কম মনোবল সম্পন্ন হয় ;তাহলে সে যেন অন্তত সাতাইশা রাতে জাগ্রত থাকে এবং ইবাদত করে। কেননা এই শেষ দশরাতের মধ্য থেকে বেশীর ভাগ সময়ে এই রাতটিতেই শবে কদর হয়ে থাকে। আর আমি বলি—সেই রাত শবে কদর না হলে নাই হলো, বরং অন্য কোন মা'মুলি রাতই হোক না, তবুও আপনারা তো শবে কদরের নিয়তেই ইবাদত করলেন। সুতরাং আপনাদের সওয়াব তো ইনশাআল্লাহ কোথাও চলে যায়নি। আল্লাহ চাইলে আপনারা শবে কদরের সওয়াবই পাবেন। কেননা তাঁর দরবারে দেখা হয় নিয়ত। হাদীস শরীফে আছে, সকল কাজে নিয়তের গ্রহণযোগ্যতা থাকবে। বন্ধুগণ! এখন তো আপনাদের জন্য বিষয়টি অনেক সহজ হয়ে গেলো। এরপরও যদি হিম্মত না করেন তবে তো গযবের ব্যাপার।

ইতিকাফের ফযীলত

রমযান শরীফের শেষ দশদিনের তৃতীয় সৌন্দর্য এটা যে, এর মাঝে ইতিকাফ করা সুন্নত। ইতিকাফের তরীকা হলো এই যে, রমযানের বিশ তারিখের মাগরিবের নামাযের পূর্বে মসজিদে চলে আসবেন এবং ইতিকাফের নিয়ত করে ফেলবেন এবং যখন ঈদের চাঁদ দেখা হয়ে যাবে তখন বাহিরে বের হবেন। যদি পূর্ণ দশদিনের ইতিকাফ করতে না পারেন তবে তার চেয়ে কমসময়ের জন্য করুন। এমন চিন্তা করবেন না যে, ইতিকাফ করলে পূর্ণ দশদিনেরই ইতিকাফ করতাম, এর চেয়ে কম সময়ে কী ফায়দা হবে? কেননা যদি বড় স্তরের সওয়াব না পাওয়া যায়, অন্তত ছোট স্তরের সওয়াব তো পাওয়াই যাবে।

বন্ধুগণ! যদি দশদিন না করতে পারেন, নয়দিনই করুন। এই পরিমাণও যদি না হতে পারে তাহলে সাতদিনই করুন। মোটকথা যতটুকুই সম্ভব হয় করুন, ছাড়বেন না। ইতিকাফের আরো একটি অনেক বড় সৌন্দর্য এটি যে, ইতিকাফকালে প্রতি মুহূর্তে ইতিকাফকারী ব্যক্তি নামাযের সওয়াব লাভ করে। কেননা হাদীস শরীফে আছে যে, যদি মসজিদে বসে নামাযের অপেক্ষা কর তাহলে অপেক্ষার মাঝেও নামাযেরই সওয়াব পাবে। আর এটা তো পরিস্কার যে, যে ব্যক্তি ইতিকাফ করবে সে সবসময় মসজিদেই থাকবে। তাহলে অবশ্যই নামাযের অপেক্ষাও তার মাঝে থাকবে। সে যদি ঘুমিয়েও যায় তাহলে এই নিয়তে ঘুমাবে যে উঠে অমুক নামায পড়তে হবে। যদি কোন কাজও করে তাহলে এই নিয়তে করবে যে, অমুক নামায পর্যন্ত এই কাজ করবো। মোটকথা তার ঘুম–জাগরণ, উঠা–বসা, প্রতিটি কাজেই সে সওয়াব আর সওয়াবই পাবে। এর চেয়ে বড় সৌন্দর্য আর কী হতে পারে?

বৃদ্ধ পিতার খেদমত করা অত্যন্ত জরুরী

হাদীস শরীফে এসেছে, একবার হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সাহাবায়ে কেরাম উপস্থিত ছিলেন। তখন

হুযূর (সাঃ) এরশাদ করলেন—লাঞ্ছিত হয়ে গেলো সেই ব্যক্তি এবং এই কথাটি তিনি কয়েকবার বললেন। সাহাবায়ে কেরাম ভয় পেয়ে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন—হযরত! কোন্ ব্যক্তি লাঞ্ছিত হয়েছে? তিনি এরশাদ করলেন—প্রথমত সেই ব্যক্তি লাঞ্ছিত হলো, যে নিজের জীবনে বৃদ্ধ মাতাপিতাকে পেলো এবং তাদের খেদমত করে জান্নাত লাভ করলো না। এখানে হুযূর (সাঃ) বৃদ্ধ মাতাপিতার খেদমত করতে বহু তাকীদ করেছেন। কেননা মাতাপিতা যদি নিজে জওয়ান থাকতো, তাহলে প্রথমত তারা তার মুখাপেক্ষী হতো না। তার হাত–পা যেমন চলে, তাদের হাত–পাও তেমনি চলতো। দ্বিতীয় কারণ এটাও যে, জওয়ান মাতাপিতার খেদমতে মন সংকুচিত হয়ে যায় না। এজন্য তাদের খেদমত করায় কোন মুশকিলও নেই, কোন কামালও নেই, শ্রেষ্ঠত্বও নেই। থাকলো বৃদ্ধ পিতামাতা। তারা তার মুখাপেক্ষী হয় এবং তাদের সব শক্তি কমে যায়। এজন্য তারা নিজেরা কিছুই করতে পারে না। যেহেতু অধিকাংশ কাজ তাদের স্বভাব ও রুচি অনুযায়ী হয় না, তাই তাদের মেযাজে রাগ চলে আসে। সুতরাং এমন মাতাপিতার খেদমত করা খুবই জরুরী। কেননা সেই বেচারারা সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে যায় এবং সকল দিক থেকেই তার মুখাপেক্ষী হয়ে যায়। তাদের রাগী–স্বভাবের কারণে বিরক্ত ও নিরুৎসাহী হয়ে যাওয়া মারাত্মক গুনাহ।

অধিকাংশ মানুষ মাতাপিতার খেদমত থেকে অনাগ্রহী হয়ে যায়, কারণ তারা নিজেদের শৈশব ভুলে যায় এবং একটি কাহিনী

কিন্তু দেখা যায় অধিকাংশ মানুষই মাতাপিতার খেদমত থেকে অনাগ্রহী হয়ে যায়; যার বড় কারণ এটা যে, তারা নিজেদের শৈশবের কথা ভুলে যায়। তারা ভুলে যায় সেইসময় মাতাপিতা তাদের কী কী আবদার পূরণ করেছেন। যদি সেইসব কথা তাদের মনে থাকতো তাহলে তারা মাতাপিতার খেদমতের ব্যাপারে অনাগ্রহী থাকতো না। এক বানিয়ার এই গল্পটি মশহুর হয়ে আছে যে, সে তার বার্ধক্যকালে একবার তার ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলো—এই দেওয়ালের উপরে কী বসে আছে?

সাহেবযাদা প্রথমে তো মনে মনে খুব বিরক্ত হলো যে, এই ফালতু কথা জিজ্ঞাসা করার আপনার কী দরকার? কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুটা গুরুত্ব দিয়ে মুখে উত্তর দিলো—আব্বাজান! কাক। কাক বসে আছে।' বানিয়া আবারো জিজ্ঞাসা করলো—দেয়ালের উপরে কী বসে আছে? সাহেবযাদা জবাব দিলো—এইমাত্রই তো বলেছি—কাক বসে আছে।' তৃতীয়বার বানিয়া আবারো একই কথা জিজ্ঞাসা করলো। এবার সাহেবযাদা রেগে গিয়ে উত্তর দিলো—তোমার তো মাথা খারাপ হয়ে গেছে। চুপ করে শুয়ে থাকো।' তখন বানিয়া নিজের হিসাবের খাতাটা চাইলো এবং খুলে দেখালো যে, সাহেবযাদা! দেখো তুমি তোমার শৈশবকালে এই কথাটাই আমাকে একশতবার জিজ্ঞাসা করেছো আর আমি প্রতিবার মহব্বতের সাথে উত্তর দিয়েছিলাম। অথচ তুমি দুইবারেই সংকুচিত হয়ে গিয়েছ।' কিন্তু হয়তো কেউ বলতে পারে যে, সাহেব! বৃদ্ধদের রাগী স্বভাব তো খোদ তবীয়তের কাছেই খারাপ লাগে, এ কোন ইখতিয়ারের বিষয় তো নয়; যদি তার জন্যও পাকড়াও হয় তাহলে তো খুব মুশকিল হয়ে যাবে। এর জবাব হলো—আল্লাহ তাআলা তবীয়তের সংকোচনের জন্য কোন পাকড়াও করবেন না। কালামে পাকে মাতাপিতার হক সম্পর্কিত বিষয় উল্লেখের পাশাপাশি আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন—

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَكُوْنُوْا صَالِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا –

এই আয়াতের নির্যাস কথা হলো, মাতাপিতার সবসময়ের রাগী স্বভাবের কারণে যেই সংকোচন ও বিড়ম্বনা তোমাদের অন্তরসমূহে সৃষ্টি হয় এবং তার কারণে যদি রুক্ষ কোন কথা তোমাদের মুখ থেকে বের হয়ে যায় তাহলে সে কারণে তোমাদেরকে ধরা হবে না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা অন্তরের ইচ্ছা সম্পর্কে অবগত। যদি তোমাদের অন্তরে মাতাপিতার আনুগত্য থাকে এবং সদাচার তোমাদের ওপর প্রবল থাকে এবং নিজের বেয়াদবির জন্য ওযরও পেশ করতে থাক, তাহলে আল্লাহ তাআলা এই ধরনের ব্যাপারগুলোকে মাফ করে দেন।

এই একজন ব্যক্তি লাঞ্ছিত হলো। দ্বিতীয় হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার সামনে আমার নাম উচ্চারণ করা হলো, কিন্তু সে দরূদ পড়লো না। তৃতীয় হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার সামনে দিয়ে রমযান আসলো এবং চলেও গেলো, কিন্তু নিজের গুনাহ মাফ করিয়ে নিতে পারলো না অর্থাৎ মন্দকাজসমূহ থেকে তওবা করলো না এবং এমন কাজও করলো না যার দ্বারা গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

রমযান শরীফের ফযীলত

হাদীস শরীফে এসেছে, রমযান শরীফ এমনই বরকতের মাস যে, তার প্রথম অংশে আল্লাহ তাআলার রহমত বর্ষিত হয়, মধ্যম অংশে বান্দাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হয় এবং শেষ অংশে দোযখ থেকে বান্দাদের সম্পূর্ণ মুক্তি চলে আসে। এর দ্বারা বুঝা গেলো যে, রমযান মাস আপাদমস্তক রহমতে ভরপুর। তাই মানুষের উচিত এই মাসে নিজের গুনাহ ক্ষমা করিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা। এর তরীকা হলো এই যে, নেক কাজ করুন। এ কথার দ্বারা এটাও বুঝা গেলো যে, গুনাহ মাফ করিয়ে দেওয়া বান্দার ইখতিয়ারের অন্তর্ভুক্ত। তাই তওবা করে নেক কাজ করা শুরু করে দিন, সব গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। স্বয়ং আল্লাহ পাক এরশাদ করেন—নিজের প্রভুর নিকট থেকে গুনাহ মাফ করিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি করো এবং দৌড়ে যাও সেই জান্নাতের দিকে, পরহেযগারদের জন্য যা তৈরী করা হয়েছে। যে ব্যক্তিই এই নিয়ম অনুযায়ী আমল করবে সে-ই নিজের গুনাহ মাফ করিয়ে নিতে পারবে আর যে ব্যক্তি এই আমল করবে না সে বঞ্চিত থাকবে। অতএব পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, গুনাহ মাফ করানো খোদ আমাদেরই ইখতিয়ারে। যদি আমরা চাই, তাহলে পরহেযগার হয়ে নিজেদের গুনাহ মাফ করিয়ে নিতে পারি।

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

জাহেল ওয়ায়েযদের মারাত্মক গলদ

যেসব লোকেরা এলম ব্যতীত ওয়ায করে থাকে, তারা এক্ষেত্রে বড়ই মারাত্মক ভুলটি করে বসে। কেননা তারা তাদের ওয়াযে বলে থাকে—আল্লাহ তাআলার সত্তা সম্পূর্ণ বেপরোয়া ও অমুখাপেক্ষী সত্তা। তিনি চাইলে সামান্য কারণেই মাফ করে দেন এবং চাইলে সামান্য কারণেই জাহান্নামে পাঠিয়ে দেন। তারা এই বক্তব্যটি এমনভাবে বলেন যে, তার দ্বারা লোকজন এটা মনে করে বসে যে, (তওবা তওবা) আল্লাহ তাআলার কাছে কোন নিয়ম-নীতিই নির্ধারিত নেই। বরং এমনিতেই যেন-তেনভাবে বিচার-আচার ছাড়াই যা ইচ্ছা, তাই করে দেন। এমন কথাবার্তা শুনে অধিকাংশ মানুষ নিরাশ হয়ে যায়। এ কারণে যে, তারা ভয় পেতে থাকে—খোদা জানেন কোন্ কারণে হঠাৎ আবার পাকড়াও হয়ে যাই এবং করে যাওয়া সব মেহনতই বরবাদ হয়ে যায়। অতঃপর এই নিরাশা বেড়ে যাওয়ার কারণে তারা ইবাদতের মাঝে মেহনত করা ছেড়ে দেয়। একইভাবে বহু মানুষ প্রাণভরে গুনাহ করতে লেগে যায়। আর বলে থাকে আল্লাহ তাআলার কাছে যখন নির্ধারিত কোন নিয়ম-নীতিই নেই, সামান্য কারণেই জান্নাত দিয়ে দেন, সামান্য কারণেই দোযখে পাঠিয়ে দেন, তাহলে আমরা কেন নিজেদের মজা ও উপভোগ নষ্ট করবো? খামাখা কেন বিপদ-মুসীবতে আবদ্ধ হবো? হয়তো এইসব কাজেরই কোন একটা আল্লাহর পছন্দ হয়ে যাবে, যার ফলে তিনি দয়াপরবশ হয়ে আমাদের ক্ষমা করে দিবেন।

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

খুদায়ী কি সেই অন্যায় নগরের বাদশাহী হয়ে গেলো নাকি, যেখানে সব কাজকর্মই উল্টাপাল্টাভাবে চলে?

অন্যায় নগরের অদ্ভুৎ কাহিনী

প্রসিদ্ধ আছে যে, এক গুরু এবং তার চেলা সফর করতে করতে এক শহরে গিয়ে হাযির হলো। শহরের নাম জিজ্ঞাসা করে তারা জানতে পারলো, শহরের নাম অন্যায় নগর (এর অর্থ হলো অবিচার ও

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

বেইনসাফীর শহর)। সেখানকার বাজারে গিয়ে বিভিন্ন জিনিসের দরদাম জিজ্ঞাসা করে তারা জানতে পারলো—তরিতরকারী থেকে ঘি-দুধ পর্যন্ত সব কিছুই পাওয়া যায় ষোল সের পরিমাণ পর্যন্ত। একথা শুনে চেলা খুব খুশী হয়ে গেলো যে, বেশী বেশী দুধ-ঘি খেয়ে মোটা হয়ে যাবো। তবে গুরু বললো—এই জায়গায় থাকা ঠিক হবে না। এই শহর তো মারাত্মক বিচার-আচারহীন শহর মনে হচ্ছে। এখানে ছোট-বড়র মাঝে কোন পার্থক্যই নেই। কিন্তু থাকার জন্য চেলা জিদ ধরলো। শেষ পর্যন্ত তারা থেকে গেলো।

কয়েকদিনের মাঝে ভ্রমণ করতে করতে তারা রাজার কাছারীতে গিয়ে পৌছলো। তারা দেখলো, রাজার সামনে একটি মামলা পেশ হয়েছে এবং বহুলোক সেখানে একত্রিত হয়ে আছে। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলো—এক চোর এক মহাজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে যে, আমরা দুইজন চুরি করার জন্য তার বাড়ীতে গেলাম, গায়ে তেল মালিশ করলাম। তারপর আমার সাথী ভিতরে ঢুকতে শুরু করতেই দেয়াল ভেঙে তার উপর পড়লো ; সে মারা গেলো। তাই আমি এই মহাজনের কাছ থেকে এই মৃত্যুর বদলা চাই। এবার সেই মহাজনকে জিজ্ঞাসা করা হলো—সে এমন দেয়াল কেন বানিয়েছিলো? সে জবাব দিলো—বাড়ির নির্মাতাকে জিজ্ঞাসা করা হোক।' তাকে ডেকে আনা হলো। সে বললো—গাড়া (সুরকি-সিমেন্টের মশলা) প্রস্তুতকারীকে জিজ্ঞাসা করা হোক।' তাকে ডাকা হলো। সে বললো—পানি পরিবেশক পানি পরিমাণে বেশী ফেলে দিয়েছিলো, যার ফলে গাড়া পাতলা হয়ে গেছে।' পানি পরিবেশককে ডাকা হলো। সে বললো—সরকারী হাতি আক্রমনোদ্যত হয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে আসছিলো, ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, পানি সেজন্য বেশী পড়ে গেছে।' হাতির চালককে ডাকা হলো। সে বললো—এক মহিলা পদাভরণ বা নুপুর পরে আসছিলো, সেটার ঝংকারে হাতি দৌড়াতে শুরু করেছে।' মহিলাকে ডাকা হলো। সে বললো—স্বর্ণকার এই ধরনের বাদ্য-উপকরণ লাগিয়ে দিয়েছিলো।' স্বর্ণকারকে ডাকা হলো। সে কোন জবাব দিতে পারলো না। নির্দেশ দেওয়া হলো—স্বর্ণকারকে ফাঁসি দিয়ে দাও।' তাকে ফাঁসি দেওয়ার জন্য

রক্ষীরা নিয়ে গেলো। যখন তাকে ফাঁসিতে ঝুলানো হলো, তখন দেখা গেলো ফাঁসির দড়ির ফাঁদ তার গলার চেয়ে বড়। লোকেরা এসে রাজাকে বললো—ফাঁসির ফাঁদ তো তার গলার চেয়ে বড় হয়ে আছে। রাজা বললো—ঠিক আছে, তাহলে কোন মোটা মানুষ খুঁজে এনে ফাঁসি দিয়ে দাও। রাজার লোকেরা মোটা মানুষ খুঁজতে শুরু করলো।

ঘটনাক্রমে সব মানুষের মাঝে সেই চেলার চেয়ে মোটা আর কাউকে পাওয়া গেলো না। শেষ পর্যন্ত তাকেই ফাঁসিতে ঝুলানোর জন্য ধরে নেওয়া হলো। এবার তো চেলা সাহেব খুব বিমর্ষ হয়ে পড়লো এবং গুরুকে বললো, আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে বাঁচান। গুরু জবাবে বললো—আমি বলছিলাম না, এখানে থাকা ঠিক নয়, শেষ পর্যন্ত ফলাফল দেখলে তো? কিন্তু গুরু শেষমেষ এই উপায় বের করলো যে, ফাঁসি দেওয়ার সময় নিজেই এগিয়ে গিয়ে বললো, লোকসকল! তাকে ফাঁসি দিও না, আমাকে দিয়ে দাও। লোকেরা কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বললো, এখন আমি আমার পুঁথি দেখে জানতে পারলাম, এই মুহূর্তে যেই ব্যক্তিকে ফাঁসি দেওয়া হবে, সে সোজা বেহেশতে চলে যাবে। একথা শোনামাত্রই রাজা এগিয়ে গিয়ে বললো—আচ্ছা! ব্যাপার যখন এমনই, তখন আমাকে ফাঁসি দিয়ে দাও, যেন আমি সোজা বেহেশতে চলে যেতে পারি। অবশেষে রাজাকেই ফাঁসি দিয়ে দেওয়া হলো।

একইভাবে এইসব জাহেল ওয়ায়েযের বয়ান থেকে বুঝা যায় যে, –তওবা তওবা– খোদার কাজও অন্যায় নগরের রাজার মত উল্টা–পাল্টা হয়ে থাকে। বন্ধুগণ! মনে রাখবেন, আল্লাহ তাআলার কাছে সবকিছু নিয়ম অনুযায়ী হয়ে থাকে। সওয়াবেরও নিয়ম আছে, আযাবেরও নিয়ম আছে। সওয়াবের নিয়ম তো এটাই, যা এখন বলা হলো, অর্থাৎ তওবা করে গুনাহ মাফ করিয়ে নিন এবং নামাযী ও পরহেযগার হয়ে জান্নাত অর্জন করুন।

ভবিষ্যতে গুনাহ হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকলেও তওবা ছাড়বেন না এবং একটি নেহায়েত সুন্দর উদাহরণ

যদি এই ভয় সৃষ্টি হয় যে, তওবা ভেঙে যাবে এবং সমূহ গুনাহ থেকে বিরত থাকতে পারবো না, তখনও মনোবল হারাবেন না। কেননা তওবা ভেঙে গেলেও আবার তওবা করে নিতে হবে। দেখুন! যদি একটি কাপড় ছিঁড়ে যায়, তাহলে ছেঁড়া অবস্থাতেই তাকে ছেড়ে রাখা হয় না, বরং তখনই লোকে সেলাই করে নেয়। এই চিন্তা তখন করা হয় না যে, এটা তো সেলাইয়ের পর আবার ছিঁড়ে যাবে, আবার ফেটে যাবে। বরং ছিঁড়ে গেলে আবার সেলাই করে নেওয়া হয়। একই অবস্থা তওবারও। শুধু তওবা ভেঙে যাওয়ার ভয়ে তওবাকে না ছাড়া চাই। বরং যদি ভেঙেও যায় আবারো তওবা করে নিবেন। তওবার দরজা এখনো বন্ধ হয়ে যায়নি। শুধু তাই নয়, যদি দিনে শতবারও তওবা ভেঙে যায় নিরাশ হবেন না। কারণ সেই তওবা ছেড়ে দেওয়ার ফলে গুনাহর ক্ষেত্রে আমাদের সাহস বেড়ে যায়। কেননা যে ব্যক্তি তওবা করতে থাকবে, তার অন্তরে আল্লাহ তাআলার বড়ত্বের অনুভূতি কিছু না কিছু অবশ্যই থাকবে এবং গুনাহ থেকে বিরত থাকার এটাই বড় উপায়। কিন্তু যে ব্যক্তি কখনো তওবা করবে না, সে তো আল্লাহকে সম্পূর্ণই ভুলে যাবে। যখন আল্লাহ তাআলার বড়ত্বের অনুভূতি তার অন্তরেই থাকবে না, তখন যতকিছুই সে করুক, তার কাছে মনে হবে সামান্যই।

কুরআন শরীফ শুনানোর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ না করা উচিত

এবং একথাও স্মরণ রাখা চাই যে, এই শেষ দশদিনে বহু মসজিদে কুরআন শরীফ খতম হবে। তখন অধিকাংশ লোকই কুরআন শরীফ তেলাওয়াতকারীকে কিছু দিয়ে থাকে। তেলাওয়াতকারীর উচিত কিছুতেই তা গ্রহণ না করা। দ্বিতীয়ত অধিকাংশ মসজিদে খতমের দিনে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। এক্ষেত্রে যেসব উল্টাপাল্টা কাজ হয় তা সকলেই জানেন। এইসব অর্থহীন বিষয়ে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী যেসব দোষ ও অসিদ্ধতা ঘটতে শুরু করেছে, বেশ কয়েকবারই সেই বয়ান হয়ে

গেছে। এখন সেই আলোচনার পুনরাবৃত্তি করার সময় নেই, প্রয়োজনও বেশী নেই। শুধু এতটুকু বলা যায় যে, এইসবের মাঝে যেই অসিদ্ধতাগুলো রয়েছে, তার উপর দৃষ্টি রাখুন এবং লক্ষ্য রাখুন, এর মাঝে কোন অসিদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে গেলো–কিনা। হয়ে থাকলে তা বর্জন করুন। দেখুন—এসবের কারণে কিন্তু বেচারা গরীবের ওপর মস্তবড় বোঝা চেপে বসে।

কুরআন শরীফ খতমের সময়
মিষ্টি বিতরণে বহু অসিদ্ধতা বিদ্যমান

আমার নিষেধ করার পর কয়েকজন গরীব জোলা খুবই খুশী প্রকাশ করে বলেছে—প্রতিবছর আমাদের চাঁদা দেওয়ার বিপদে পড়তে হতো। আপনি আমাদেরকে এই বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। বুঝা গেলো, চাঁদা দেওয়া লোকজনের জন্যে খুবই কঠিন কাজ। অতঃপর বলুন—এই চাঁদা গ্রহণ করা কিভাবে জায়েয হতে পারে? কয়েক জন নেতৃস্থানীয় লোক আমাকে বলেছেন—আপনি গরীবদের নিষেধ করুন, ধনীদেরকে নিষেধ করার প্রয়োজন নেই। এটি সম্পূর্ণ ভুল চিন্তা। কারণ যদি ধনীরা না ছাড়ে তাহলে লজ্জার কারণে গরীবদেরও ছুটা মুশকিল হয়ে যাবে। আর যদি ধনীরা ছেড়ে দেয় তাহলে গরীবদের জন্য ছেড়ে দেওয়া কোন দুরূহ ব্যাপার হবে না। কোন কোন মসজিদ এমনও রয়েছে যে, সেখানে চাঁদা তুলে মিষ্টি বিতরণ হয় না, বরং সচ্ছল লোকেরা নিজ নিজ পক্ষ থেকে বিতরণ করে থাকে। সে ক্ষেত্রে অন্য কোন অসিদ্ধতা সেখানে বিদ্যমান থাকে যেমন প্রদর্শন করা, প্রসিদ্ধি লাভ, নাম ছড়ানো ইত্যাদি। আর সকল অবস্থাতেই শিশু এবং বেনামাযীদের পাড়াপাড়ির ফলে মসজিদের বেয়াদবী হওয়া এবং এ ধরনের আরও বহু অসিদ্ধতা তাতে রয়েছে। বুদ্ধিমান মানুষ নিজে নিজেই সেগুলো বুঝতে পারে।

একবার বেরেলীতে কুরআন শরীফ শুনানোর সুযোগ ঘটে গেলো। আমার ভাই আমাকে মিষ্টি বিতরণ করার কথা বললেন। আমি মানা করলাম। কিন্তু তিনি বললেন, কী অসুবিধা আছে? যখন তিনি বারবার বললেন, আমি চুপ হয়ে গেলাম এবং মনে মনে চিন্তা করলাম, উত্তম

এটাই যে, তিনি নিজেই এই অসিদ্ধতাগুলো দেখে নিন। অতঃপর তিনি নিজের ব্যবস্থাপনায় মিষ্টি বিতরণ করলেন। লোকজনের অসৌজন্যমূলক আচরণ দেখে তিনি এই পরিমাণ পেরেশান হলেন যে, যখন মিষ্টি বিতরণ করা শেষ হলো, তখন নিজেই বললেন—আপনার রায় একদম ঠিক ছিলো। আসলেই এগুলো অর্থহীন ব্যাপার। এই নিস্ফল কাজ কখনই করা উচিত নয়। কিন্তু আফসোস এটাই যে, কিছুলোক অসিদ্ধতাসমূহ বুঝতেও পারে, তথাপি এই বেহুদা কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে না।

এই ওয়াযে রমযানের শেষ দশদিনের যে হুকুম-আহকাম বয়ান করা হলো, তার সবগুলোই মনে রাখা চাই এবং চেষ্টা করতে থাকা চাই যে, এগুলোর ওপর যেন পরিপূর্ণ ভাবে আমল এসে যায়। আল্লাহর কাছে দুআ করা চাই, যেন তিনি আমলের তাওফীক দান করেন।

রোযা এবং ঈদের পরিপূর্ণতা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نومن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئت اعمالنا من يهد ه الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادى له و نشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له و نشهدان سيدنا و مولنا محمدا عبده و رسوله صلى الله تعالى عليه و على اله واصحابه و بارك و سلم اما بعد فقد قال النبى صلى الله عليه و سلم شهر رمضان هو شهر اوله رحمة واو سطه مغفرة واخره عتق من النار -

তরজমা ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান শরীফ সম্পর্কে এরশাদ করেছেন, রমযান এমন একটি মাস যে, তার প্রথম অংশ হচ্ছে রহমত, মাঝের অংশ গুনাহসমূহের ক্ষমা এবং শেষ অংশ হচ্ছে দোযখ থেকে মুক্তি।

এ সম্পর্কেই এই আলোচনা।

রমযান শরীফের সমূহ গুণাবলী ও সৌন্দর্য পূর্ববর্তী জুমায় সবিস্তার বয়ান করা হয়েছে। আজ শুধু দুইটি বিষয় আলোচনা করা হবে। একটি হলো এই যে, রমযানের যে কয়টা দিন এখনো বাকী আছে সে সম্পর্কে আলোচনা। দ্বিতীয়টি হলো, ঈদ সম্পর্কে কিছু আলোচনা। যেহেতু এই হাদীসের সাথে উভয় বিষয়েরই সম্পর্ক বিদ্যমান, তাই এই হাদীসকে বয়ানের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। এই হাদীসখানা মূলত অনেক বড় একখানা হাদীসের খণ্ডিত অংশ ; যে হাদীসখানা হুযূর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম শা'বান মাসের শেষ জুমার খুৎবায় পড়েছিলেন। এই হাদীস দ্বারা এটাও জানা গিয়েছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শা'বান মাসের শেষ জুমায় একটি বিশেষ খুৎবা পড়েছিলেন, অন্যান্য জুমায় যা পড়তেন না।

রমযানের শেষ জুমায় খুৎবাতুল বিদা পড়া বিদ'আত

কতিপয় মুসলমানের ব্যাপারে অবাক লাগে যে, তারা এই খুৎবাটির প্রতি মনোযোগ দেয়নি এবং শা'বানের শেষ জুমার জন্য এই খুৎবাকে নির্ধারণ করেনি, যার দ্বারা সুন্নতের পাবন্দী হতো ; বরং এর পরিবর্তে রমযানের শেষ জুমার জন্য একটি বিশেষ খুৎবা নির্বাচন করে নিয়েছে এবং তার নাম দিয়েছে খুৎবাতুল বিদা। হাদীসের কোথাও যার কোন পাত্তাই নেই। তারপর সেই খুৎবার প্রতি এ পরিমাণ গুরুত্ব তারা দিয়ে রেখেছে যে, যদি সেই খুৎবাটি না পড়া হয় তাহলে মনে করে জুমাটাই শুদ্ধ হলো না। এখন যাই হোক, সেই বানানো খুৎবার প্রতি গুরুত্ব প্রদান আগের চেয়ে কিছুটা কমেও গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বহুলোক এমন রয়েছে, যারা এই ধারণা পোষণ করে যে, এই বিদায়ী খুৎবা রমযানের শেষ জুমার জন্য জরুরী।

ঈদগাহে শিশুদের নিয়ে যাওয়া এবং তার অসিদ্ধতা

আজকাল ব্যাপকভাবে দেখা যায় যে, শিশুদেরকে ঈদগাহে নিয়ে যাওয়ার রেওয়াজ হয়ে গেছে। থাকেই দেখবেন সে নিজের সঙ্গে একদম বাচ্চা শিশুকে অবশ্যই নিয়ে এসেছে। আর আশ্চর্যের কথা হলো এই যে, প্রতিবছর এ কারণে কষ্টভোগ করতে হয়, তথাপি লোকেদের সামান্য হুঁশ হয় না। সম্ভবত কোন বছরই এমন হয় না যে, ঈদগাহে গিয়ে শিশুরা বিশেষত নামাযের সময় কান্নাকাটি ও চিৎকার শুরু করে দেয় না। বরং দু-এক বাচ্চা তো পায়খানা-প্রস্রাবও করে দেয়। খোদ আমার সামনে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা। আমার ছাত্র যমানায় আমার এক

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

আত্মীয়, তখন যার বয়স ছিল খুবই কম—আমার আব্বাজানের সাথে ঈদগাহে গেলো। ঠিক নামাযের সময় সে পায়খানা করানোর কথা বললো। তার এই ফরমায়েশ শুনে মারাত্মক পেরেশানী সৃষ্টি হলো। প্রথমত ঠিক নামাযের সময়, দ্বিতীয়ত মিরাটের ঈদগাহ, যেখানে হাজার হাজার মানুষের ভীড়। ধারে কাছে কোথাও এমন জঙ্গলও ছিলো না, যেখানে তাকে বসিয়ে দেওয়া যায়। শেষে সিদ্ধান্ত এই হলো যে, একজনকে চারআনা পয়সা দেওয়া হলো। সে নিজের কাঠের চৌকির নিচে তাকে বসিয়ে দিলো। চারদিকে কাপড় ঝুলানো ছিলো। উপরে রঙ–বেরঙের মিঠাই সাজানো আর ভিতরে রাখা ছিলো এই 'উপহার'। এখান থেকে একটি নসীহতের কথা খেয়াল হয়েছে যে, আমাদের অবস্থাটাও এমনই। এই মিঠাইয়ের মত আমাদের বাহ্যিক অবস্থা অত্যন্ত আলো ঝলমলে সাজানো এবং সজীব–সতেজ থাকে কিন্তু আমাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা এমন, যেন তা মুরগীর বিষ্ঠা। বাজে ভাবনা–চিন্তায় তা পরিপূর্ণ। বাহ্যিক অবয়ব তো এমন যে, দর্শকদের মনে হতে থাকে যদি ওহী আসা বন্ধ না হয়ে যেত তাহলে হযরত জিবরাঈল (আঃ) তার কাছেই চলে আসতেন। আর তার অন্তরের অবস্থা হলো এই যে, সে শয়তানের চেয়েও বড় শয়তান।

জামাতের হেকমতসমূহ

জামাতের সাথে নামায পড়ার মধ্যে একটি বড় সৌন্দর্য এটাও যে, সকলের নামায একত্রিত হয়ে আল্লাহর দরবারে পেশ হবে। যদি কোন একজনও কবুল হওয়ার উপযুক্ত হয় তাহলে তার বরকতে সকলের নামাযই কবুল হয়ে যাবে। এই সৌন্দর্য ও গুণের কারণেই জামাতের প্রতি আমাদেরকে যত্নবান হতে অত্যন্ত তাকীদ করা হয়েছে। এরচেয়ে বেশী আর কী হতে পারে যে, যদি একাকী নামায পড়ার ক্ষেত্রে কারো মনোযোগ বিচ্ছিন্ন না হয় এবং জামাতের সাথে পড়ার ক্ষেত্রে মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং নানা ধরনের ওয়াসওয়াসা, মন্ত্রণা–প্ররোচনা অন্তরে আসে, তথাপি জামাতের সাথেই সেই ব্যক্তির নামায পড়া চাই। যদি অন্তরে ওয়াসওয়াসা আসে, আসুক না। ওয়াসওয়াসাকে বাধা

দেওয়ার জন্য শরীয়ত এ পরিমাণ তাকীদ করেনি যে, সে কারণে জামাতই ছেড়ে দিতে হবে।

হুকুম-আহকামের মাছলেহাত বা কল্যাণময় কারণ উপলব্ধি করা যে কোন ব্যক্তির কাজ নয়

কোন কোন লোক বিভিন্ন বিদআত সম্পর্কে বহুবিধ মাছলেহাত বর্ণনা করে থাকে। অথচ মাছলেহাত উপলব্ধি করা প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম নয়। এটা তো তার কাজ, যার যাহেরী এলমও রয়েছে এবং আল্লাহর মদদও তার সাথে রয়েছে। এবং তার চিহ্ন হলো, আলেমগণও তার অভিমতকে গ্রহণ করেছে আর মৌলবীদের দলও তার দিকে ধাবিত হয়েছে।

গ্রামে জুমা ছহীহ হওয়া না হওয়া এবং বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি অত্যন্ত সুন্দর জবাব

দেখুন! কোন কোন লোক জুমা সম্পর্কে এ কথা বলে যে, যদিও গ্রামে জুমা সহীহ হয় না, তথাপি না পড়া থেকে পড়া সবদিক থেকে উত্তম। আপনারা দেখলেন—নিজের রায় ও মতামতের দখল দিয়ে কী মারাত্মক ভুল করে বসেছে? আমি উত্তর দিয়েছি, ব্যাপার যদি এটাই হয়, তাহলে বলুন, এক ব্যক্তি বলে যে, বোম্বাইয়ে তো হজ্জ হয় না, কিন্তু তারপরও যদি করে নেওয়া হয়, তাহলে না করা থেকে উত্তম হবে, এই কথার কী জবাব দেবেন? এটাই তো বলবেন—আরে ভাই! বোম্বাই তো হজ্জের জায়গাই নয়। অতএব একই ভাবে বুঝে নিন যে, গ্রামও জুমার জায়গা নয়।

মোটকথা দ্বীন অনুধাবনের জন্য অনেক জ্ঞান-বুদ্ধির দরকার, আকলের দরকার। আলাভোলা বা হাবাগোবা হওয়ার দ্বারা কাজ হবে না। এ কারণেই যত নবী এসেছেন, তাঁরা জ্ঞান-বুদ্ধিতে, আকলে পরিপূর্ণ ছিলেন। কোন নবীই আলাভোলা ছিলেন না। অনেকেই বুযুর্গগণের তা'রীফ করতে গিয়ে বলে থাকেন—অমুক বুযুর্গ অত্যন্ত আলাভোলা ছিলেন, ডান-বাও বুঝতেন না। মনে রাখবেন—আলাভোলা হওয়া, হাবাগোবা হওয়া যদিও ভালো, কেননা তারফলে মানুষ বহু

গুনাহ থেকে বেঁচে যেতে পারে, কিন্তু তারপরও তার ফলে মানুষ বহু সৌন্দর্য থেকে বহু মর্যাদাকর বিষয় থেকে বঞ্চিত থাকে। এজন্য কোন নবীই আলাভোলা ছিলেন না। আমাদের নবীও জ্ঞান–বুদ্ধি ও আকলের ক্ষেত্রে ছিলেন কামেল বা পরিপূর্ণ।

আলাভোলা হওয়া কোন বড় কামাল বা মর্যাদাকর বিষয় নয়

বস্তুত আকল বা জ্ঞান–বুদ্ধি হচ্ছে একটি বড় নেয়ামত। আমার সামনে এক ব্যক্তি একজন সূফীকে জিজ্ঞাসা করলো—সালেকের মর্তবা বড় নাকি মাজযূবের? সূফী সাহেব এ প্রশ্নের অদ্ভূৎ সুন্দর উত্তর দিলেন। উত্তরটি আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। তিনি জবাব দিলেন—এতটুকু তো আমরা জানি যে, আকল এমনই একটি বস্তু যে, দেখো! শরাব পান করলে তা চলে যায়।

সালেক মাজযূবের তুলনায় আকলের কারণেই উত্তম

আর শরীয়ত শরাব পান করাকেই হারাম করে দিয়েছে। এটা পরিস্কার যে, সালেকের জ্ঞান–বুদ্ধি বা আকল যথাস্থানে বজায় থাকে আর মাজযূব জ্ঞান–বুদ্ধি থেকে বাহিরে অবস্থান করে। এখন তুমি নিজেই বুঝে নাও যে, সালেকের মর্তবা বড় নাকি মাজযূবের মর্তবা বড়? হযরত সুয়ূতী (রহঃ)এর একটি কিতাব রয়েছে। তাতে তিনি একটি হাদীস লিখেছেন যে, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমর (রাদিঃ)কে জিজ্ঞাসা করলেন—হে উমর! সেই মুহূর্তে তোমার কী অবস্থা হবে, যখন তোমাকে একাকী কবরে রেখে আসা হবে এবং আশ্চর্য আকৃতির দু'জন ফেরেশতা এসে তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে—আল্লাহকে তুমি এক বিশ্বাস করতে কিনা এবং নবীর প্রতি ঈমান এনেছিলে কিনা? হযরত উমর (রাদিঃ) আরয করলেন এবং কী সুন্দর জবাব আরয করলেন, এমন সুন্দর জবাব তিনি না দিলে আর কে দিতে পারত? তিনি আরয করলেন ঃ হুযূর! এই বিষয়টা এরশাদ করুন যে,

তখন আমাদের আকল বা জ্ঞান-বুদ্ধি ঠিক থাকবে কিনা? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন—হাঁ আকল বজায় থাকবে ; বরং আরো বেড়ে যাবে। হযরত উমর (রাদিঃ) এবার আরয করলেন ঃ যদি আকল বজায় থাকে, তাহলে ভয়ের কিছু নেই। আল্লাহ চাহেন তো সবকিছুই যথাযথভাবে ঘটবে।

দেখুন! এই হযরাত সাহাবায়ে কেরাম আকলের কী পরিমাণ সম্মান দিতেন এবং তাকে কত বড় নেয়ামত মনে করতেন! অথচ আমরা এমন লোক যে, জ্ঞান-বুদ্ধি বা আকল চলে যাওয়াকে বুযুর্গীর আলামত মনে করি।

হযরত রাবেয়া বসরীয়া (রহঃ)এর কাহিনী

এ প্রসঙ্গে একটি কাহিনী মনে পড়ে গেলো। কাহিনীটি কোন কিতাবে আমি দেখিনি। হতে পারে এটি ভুল বা গলদ কাহিনী। কিন্তু এই কাহিনী ভুল বা গলদ হওয়ার দ্বারা আমাদের কোন ক্ষতি নেই। কেননা আমরা আমাদের বিষয়কে হাদীস দ্বারা প্রমাণ করে দিয়েছি। যাইহোক কাহিনীটি হলো এই যে, হযরত রাবেয়া বসরীয়া (রহঃ)কে যখন দাফন করা হলো, তখন নিয়ম-অনুসারে ফেরেশতাগণ এসে তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি অত্যন্ত প্রশান্তির সাথে জবাব দিলেন ঃ বলুন! যেই খুদাকে আমি জীবনভর স্মরণে রাখলাম, একগজ মাটির নীচে এসে তাকে কিভাবে ভুলে যাবো? আপনারা নিজেদের খবরটা আগে নিন, কত দূর থেকে পথপাড়ি দিয়ে আপনারা এসেছেন ; এখনও আল্লাহকে আপনাদের স্মরণে আছে কি না? সুবহানাল্লাহ! বুযুর্গগণের প্রশান্তি কী পরিমাণ থাকে! তার কারণ হলো এই যে, তাঁদের আকল বা জ্ঞান-বুদ্ধি বজায় থাকে। সেই সূফী সাহেব বলেছেন ঃ সালেকের মর্তবা বড়। কারণ, তার আকল বাকী থাকে; যার ফলে হাজারো বিপদ-আপদ থেকে তিনি মুক্তি পেয়ে থাকেন।

একটি গ্রামে শাস্তি অবতরণের কারণ এবং গুনাহগারদের প্রতি গোস্বা না করার কারণে এক আবেদকে আযাবে শামিল করা ঘটনা

হাদীস শরীফে আছে, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন যে, অমুক শহরকে উল্টিয়ে দাও। হযরত জিবরাঈল (আঃ) আরয করলেন ঃ হে আল্লাহ! সেই শহরে অমুক ব্যক্তিও বসবাস করে, যে কখনো কোন গুনাহ করেনি, সবার সঙ্গে কি তাকেও উল্টিয়ে দেবো? এরশাদ হলো ঃ হাঁ, তাকেও উল্টিয়ে দাও। কেননা সে অন্য লোকদেরকে গুনাহ করতে দেখত, কিন্তু কখনো তাদের উপর তার গোস্বা পর্যন্ত আসত না।

নাজায়েয কাজের প্রতি আল্লাহ-প্রেমিকদের গোস্বা আসা অপরিহার্য এবং তার উদাহরণ

দেখুন! এই ব্যক্তিটি বাহ্যত এমনই বুযুর্গ ছিলো যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ)ও ধোঁকার শিকার হয়ে গিয়েছিলেন ; অথচ প্রকৃতপক্ষে সেই লোকটি ছিলো মারাত্মক একটি গুনাহে লিপ্ত। সেটি হলো, আল্লাহ তাআলা এবং তার হুকুম-আহকামের প্রতি তার সামান্যতমও ভালোবাসার আবেগ ছিল না। নচেৎ এমন হতে পারে না যে, আল্লাহ এবং রাসূলের মহব্বত থাকবে, তারপরও লোকজনকে তাঁদের হুকুম-আহকামের বিরোধিতা করতে দেখবে আর তার গোস্বা আসবে না, ক্রোধ সৃষ্টি হবে না। আজকাল যদি কোন দ্বীনদার ব্যক্তি লোকেদের কোন অনর্থক ও বাজে কাজের ওপর রাগান্বিত হয়, তাহলে লোকে তাকে বদমেযাজ বলে। বরং তাকে অভিমত জানানো হয় যে, সাহেব! নরমভাবে জবাব দেওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু আমি বলি ঃ যদি কোন ব্যক্তিকে এই কথা বলা হয় যে, আমি তোমার মাকে বাজারে এই অবস্থায় বসে থাকতে দেখেছি যে, সে দেহপসারিণীদের মত কাজকর্ম করছে, তাহলে কি সেই ব্যক্তি রেগে যাবে না? সে কি এই কথাটা ঠাণ্ডা মনে শুনবে? এই কথা উচ্চারণকারীর সঙ্গে লড়াই করতে এবং মারামারি করতে সে কি প্রস্তুত হয়ে যাবে না? তাকেও কি এই অভিমত শুনানো

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

হবে যে, নরমভাবে জবাব দিন। কক্ষণো না। অথচ মৌলবীদের প্রতি অভিযোগ যে, তারা খুব তাড়াতাড়ি রেগে যায় এবং তাদের নাকে ক্রোধ লেগেই থাকে। কিন্তু সুধীগণ! সামান্য ভাবুন এবং ইনসাফ করে দেখুন যে, কোন মৌলবীই সোজা–সঠিক কথায় রাগান্বিত হয় না এবং কোন মৌলবীরই নাকের উপর গোস্বা লেগে থাকে না। যদি জিজ্ঞাসা করার মত করে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন এবং কথা বলার মত করে তাদের সাথে কথা বলেন, তাহলে কখনো কিছুতেই কোন মৌলবী রাগান্বিত হবেন না। হাঁ যখন তাদের সামনে খুদা এবং রাসূলের হুকুম–আহকামের প্রতি অভিযোগ–আপত্তি উঠানো হয়, তখন তারা রাগ আর গোস্বা সামলাতে পারেন না এবং এই রাগ মন্দ কিছু নয় ; বরং এটা দ্বীনের হেমায়েত, দ্বীনের প্রতি আস্থা ও সমর্থনেরই প্রকাশ।

সুধীগণ! শরীয়তের বিধি–বিধানের প্রতি এতটুকু মর্যাদাবোধ ও মহব্বতও কি অন্তরে থাকতে নেই, যতটুকু আছে নিজের মায়ের প্রতি? মা সম্পর্কে অমর্যাদাকর কথা শুনে মানুষ নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে যায় এবং নিজের মধ্যে নিজে অটল থাকতে পারে না আর শরীয়তের অবমাননা দেখার পর তার মাঝে সামান্য ক্রোধেরও সৃষ্টি হয় না। এটা কী পরিমাণ বেইনসাফীর কথা! এমন পরিস্থিতিতে যাদের মাঝে গোস্বা আসে না, ক্রোধ সৃষ্টি হয় না, তাদের অন্তরে শরীয়তের মহব্বত এবং মর্যাদাই নেই। প্রথমে নিজের অন্তরে শরীয়তের মহব্বত সৃষ্টি করুন, তারপরও যদি এই অবস্থা বজায় থাকে, তাহলে বুঝবেন!

বন্ধুগণ! শুধু মৌখিক কথাবার্তা শুনে বুঝে আসতে পারে না যে, এমন মহব্বত কিভাবে এসে যায়, যার ফলে এ পরিমাণ আত্মমর্যাদা বেড়ে যায় যে, শরীয়তের প্রতি কোন বেয়াদবী দেখতে পারে না। ব্যাপার হলো এই যে, নিজের উপর এই হালত অতিবাহিত হয়নি।

বন্ধুগণ! বুযুর্গগণের আত্মমর্যাদা ও গয়রত এ পরিমাণ হয় থাকে যে, যে বস্তুই তাঁদের অন্তরকে খুদা এবং রাসূল (সাঃ) থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়, তাকেই তাঁরা গুমরাহকারী ও বিপথগামীতার কারণ মনে করেন।

হযরত তালহা (রাদিঃ)এর
আত্মমর্যাদা বা গায়রতের ঘটনা

হযরত তালহা (রাদিঃ)এর ঘটনা হলো এই যে, তিনি তাঁর বাগানে নামায পড়ছিলেন। তখন একটি প্রাণী তাতে ঢুকে পড়লো। বাগানটি ছিলো ঘন। প্রাণীটি বাহিরে যাওয়ার কোন পথ পাচ্ছিলো না। অস্থির হয়ে এদিক-সেদিক উড়তে লাগলো। তার এই অবস্থা দেখে হযরত তালহা (রাদিঃ)এর অন্তরে এক ধরনের খুশী জন্ম নিলো। তাঁর মনে জাগলো যে, আমার এই বাগানটি কত ঘন এবং গাছগুলো একটি অপরটির সাথে এমন ঘন হয়ে মিশে আছে যে, কোন প্রাণী সহজে উড়ে বাহিরও হতে পারে না। এই খেয়াল মনের মধ্যে চলে আসার পরই হুঁশ ফিরে এলো এবং মনে মনে ভাবতে লাগলেন হায় তালহা! তোমার অন্তরে মালের এমন ভালবাসা যে, নামাযের মধ্যেও সেদিকে তোমার কল্পনা চলে গেছে। নামায শেষে তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হলেন এবং আরয করলেন ঃ হুযূর! আমার বাগান আজ নামাযের মধ্যে আমাকে তার দিকে মনোযোগী করেছে এবং আমার অন্তরকে আল্লাহর দিক থেকে সরিয়ে নিয়েছে। এজন্য এই বাগানটিকে আমার কাছে রাখতে চাই না এবং এই ত্রুটি ক্ষমা করানোর উদ্দেশ্যে এই বাগানটিকেই আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দিতে চাচ্ছি। অবশেষে তিনি বাগানটিকে আল্লাহর পথে দান করে দেওয়ার পরই তাঁর প্রশান্তি এসেছে।

এই বুযুর্গগণের হালত তো এমন যে, যদি শয়তানের প্ররোচনা ও ওয়াসওয়াসায় কোন কিছু হয়, তাহলে যেন তাদের হৃদয়ের জগতের বাদশাহীই হাতছাড়া হয়ে যায়। বরং সত্য কথা তো এই যে, বাদশাহী চলে যাওয়ার দ্বারাও এতটুকু কষ্ট হয় না, যতটুকু এই বুযুর্গগণের হয়, দুনিয়ার প্রতি সামান্যতম আগ্রহ ও লোভ সৃষ্টি হওয়ার দ্বারা। হয়ত লোকজনের অবাক লাগে যে, সামান্য কল্পনার উদ্রেক হওয়ার দ্বারা তাঁরা এ পরিমাণ ব্যথিত ও উৎকণ্ঠিত কেন হয়েছেন?

তবে শুনুন! আল্লাহতে নিমগ্ন থাকা তাঁদের কাছে এমনই মূল্যবান ব্যাপার যে, তার সামনে দুনিয়ার কোনই অস্তিত্ব নেই, অবস্থান নেই। উপরন্তু তাঁদের কাছে জান্নাতও এই কারণে পছন্দনীয় যে, সেখানে

৬

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

চিরকালের জন্য আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও রেযামন্দি হাছিল হবে। নচেৎ জান্নাতের প্রতিও তাঁদের কোন পরোয়া থাকত না। আসলে তাদের উদ্দেশ্য হলো মাহবুব বা প্রেমাস্পদের সান্নিধ্য। প্রেমাস্পদের সান্নিধ্য যদি বন-জঙ্গলে লাভ হয়, তাহলে সে বন-জঙ্গলই তাঁদের নিকট হাজারো বসতির চেয়ে উত্তম।

হযরত সওবান (রাদিঃ)এর ঘটনা

হাদীস শরীফে আছে যে, এক সাহাবী ছিলেন, তাঁর নাম ছিল হযরত সওবান (রাদিঃ)। তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন, হুযূর! আমরা যদি জান্নাতে চলেও যাই, তাহলেও তো আমরা জান্নাতের সেই স্তর লাভ করতে পারবো না, যে স্তর থাকবে আপনার, আর যখন আপনার স্তরে আমরা পৌঁছতে পারবো না, তখন তো আপনাকে দেখতেও পারবো না, আর আপনাকেই যখন দেখতে পারবো না, তখন জান্নাত পেয়েই আমরা কী করবো? এই কথা শুনে হুযূর নীরব থাকলেন। সে মুহূর্তেই ওহী আসলো ; যার সারকথা হলো এই যে, যে ব্যক্তি খুদা এবং রাসূলের আনুগত্য করবে, সেও নবীগণের সাথেই থাকবে। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যে, আমাকে দেখার জন্য এবং আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য এটা প্রয়োজনীয় নয় যে, আমার স্তর লাভ করলেই দেখতে পারবে অন্যথায় নয়। বরং দেখার জন্য এবং সাক্ষাতের জন্য শুধু মহব্বত এবং আনুগত্যেরই প্রয়োজন। তাকে কোন বাঁধা-প্রতিবন্ধকতা দেওয়া হবে না। এই বিষয়টা এইভাবে বুঝে নিন যে, বাদশাহর দরবারে খেদমতগারেরা খেদমত করার জন্য আমীরগণের আগে পৌঁছে যায়। অথচ কোথায় বাদশাহর মর্যাদা আর কোথায় বেচারা খাদেম-খেদমতগার!

গায়রাত বা আত্মমর্যাদাবোধের দাবী হলো প্রেমাস্পদ ভিন্ন ব্যক্তি–বস্তুকে মিটিয়ে দেওয়া

আসলে সেই সকল হযরতের হালত এমন থাকে যে, তাঁদের সামনে আল্লাহ পাকের রেযামন্দি এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারতের বিপরীতে উভয় জাহানেরই কোন অবস্থান ও মূল্য নেই। মর্যাদাবোধ এবং মহব্বতের বৈশিষ্ট্যই এটা যে, যখন তা বেড়ে যায়, তখন সবকিছুই ছুটে যায়। হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) মর্যাদাবোধ বা গায়রতের ফলেই বাদশাহী ত্যাগ করেছেন। তার কারণ হলো এই যে, এক অবস্থায় থেকে দু'দিকে মনোযোগ দিতে হয়, আর এটা সম্ভব নয়। এজন্য একদিকের প্রতি মনোযোগ ত্যাগ করতে বাধ্য হতে হয়। আল্লাহ তাআলার দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ রাখা তাঁদের নিকট অপরিহার্য ; তাঁরা এটা ছাড়তে পারেন না। তাই দুনিয়ার গায়েই লাথি মেরে দেন।

মোটকথা আল্লাহ পাকের প্রতি যার মহব্বত হয়, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর সাথে নিমগ্ন হওয়ার ব্যাপারে তার মাঝে আত্মমর্যাদাবোধ জেগে ওঠে। এই আত্মমর্যাদাবোধের কারণেই তাঁদের মাঝে দ্বীনের জোশ সৃষ্টি হয় ; যাকে লোকে বলে যে, তাদের নাকে রাগ–গোস্বা লেগেই থাকে। অথচ এটা এমনই বস্তু যে, দেখুন সেই ব্যক্তিকে—যাকে হযরত জিবরাঈল (আঃ) নেক মনে করেছিলেন—তার মাঝে এই রাগ ও গোস্বারই তো অভাব ছিলো। তারপর কী ফলাফল হলো? যেখানে অন্য সকল গুনাহগারকে উল্টে দেওয়া হয়েছে, সেখানে তারজন্যও সেই হুকুমই হয়েছে যে, হাঁ তাকেও তাদের সঙ্গে উল্টিয়ে দাও। অথচ তার অন্য সকল কিছুই ভালো ছিল।

আকল বা জ্ঞান–বুদ্ধির বিচারে মানুষ চার প্রকার

যেসব ব্যক্তি পূর্ণ আকল বা জ্ঞান–বুদ্ধি রাখেন, হেদায়াতের কাজ তাদেরকেই সমর্পণ করা হয়। যেসব বুযুর্গের হেদায়াতের কাজের সাথে কোন সম্পর্ক থাকে না, অবশ্য কখনো কখনো তারা আলাভোলা প্রকৃতির হয়ে থাকেন। কেননা, তাদের দায়িত্ব থাকে শুধু নিজেদেরকেই

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

শোধরানো। এবং এ কারণেই যার জ্ঞান–বুদ্ধি যতটুকু থাকে সংশোধন ও সংস্কারের কাজের হুকুমও তার উপর ততটুকুই থাকে। সারকথা হলো এই যে, যেসব বুযুর্গের প্রতি হেদায়াতের কাজ সমর্পণ করা হয়, যেমন নবীগণ ; তাঁরা আলাভোলা হন না। তাঁরা অত্যন্ত জ্ঞান–বুদ্ধিসম্পন্ন বা আকলমান্দ হয়ে থাকেন আর তাঁরাই হচ্ছেন কামেল, তাঁরাই হলেন পরিপূর্ণ।

অপরদিকে যেসব বুযুর্গের সাথে হেদায়াতের কাজের কোন সম্পর্ক থাকে না, তাঁরা অবশ্য আলাভোলা হয়ে থাকেন। এজন্যই কেউ কেউ বলেছেন—মানুষ চার প্রকার। একপ্রকার মানুষ হচ্ছেন তাঁরা, যাদের দ্বীনের জ্ঞান–বুদ্ধিও রয়েছে এবং দুনিয়ার জ্ঞান–বুদ্ধিও রয়েছে ; যেমন আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এবং সেই সকল আলেম, যারা তাঁদের নায়েব বা প্রতিনিধি। হেদায়াতের কাজ তাঁদের উপর সোপর্দ করা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকার মানুষ হচ্ছেন তাঁরা, যাদের দ্বীনের জ্ঞান–বুদ্ধি আছে, দুনিয়ার জ্ঞান–বুদ্ধি নেই ; যেমন আলাভোলা বুযুর্গ। তৃতীয় প্রকার মানুষ হচ্ছে তারা, যাদের দ্বীনের জ্ঞান–বুদ্ধি নেই, দুনিয়ার জ্ঞান–বুদ্ধি আছে ; যেমন বুদ্ধিমান কাফের। চতুর্থ প্রকার হচ্ছে সেইসব মানুষ, যাদের দ্বীন–দুনিয়া কোনটারই জ্ঞান–বুদ্ধি নেই ; যেমন নির্বোধ কাফের।

মোটকথা নবীগণ (আঃ) এবং তাঁদের নায়েব উলামায়ে কেরাম জ্ঞান–বুদ্ধিতে হয়ে থাকেন পরিপূর্ণ। হতে পারে অভিজ্ঞতা তাঁদের কম। কেননা, দুনিয়াবী কাজকর্মে তো তারা নিমগ্ন থাকেন না যে, তাদের অভিজ্ঞতাও থাকবে প্রচুর। কোন কোন ব্যক্তি অদ্ভুত তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে। তারা জ্ঞান–বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতাকে একই জিনিস মনে করে বসেছে। এ দু'য়ের মধ্যে তারা কোন পার্থক্য করে না। তারা যখন আলেমদেরকে অভিজ্ঞরূপে না পায়, তখন তাঁদেরকে স্বল্প জ্ঞান, স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন এবং নির্বোধ মনে করে থাকে। অথচ অভিজ্ঞতা বা তাজরিবা আর আকল বা জ্ঞান–বুদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। একইভাবে যেসব জাতি শিল্প এবং কারিগরীতে দক্ষতা রাখে, লোকে তাদেরকে বলে অত্যন্ত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান জাতি। অথচ এই একটি কাজে তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়েছে বলে তাদেরকে কারিগর বলা উচিত, আকলমান্দ বা

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

বুদ্ধিমান নয়। কারিগর হওয়া এক ব্যাপার আর জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান হওয়া আরেক ব্যাপার।

উদাহরণ স্বরূপ যদি আমরা দার্শনিক প্লেটোকে কোন জোলার বাড়িতে নিয়ে যাই এবং তাকে জোলার কলের সামনে বসিয়ে দিয়ে বলি ঃ একটি মিহি চাদর বুনে দিন ; তাহলে সে তা কিছুতেই পারবে না, কিন্তু জোলা উত্তম থেকে অতি উত্তম চাদর বুনে দিতে পারবে। এ কারণে কি এই জোলাকে প্লেটোর চেয়ে অধিক জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান বলতে থাকবেন? নিশ্চয়ই নয়। হাঁ একথা বলবেন যে, প্লেটো এই কাজটা এতটুকু জানে না, যতটুকু এই জোলা জানে। তাই আলেমগণ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন না হলেও পরিপূর্ণ জ্ঞানী অবশ্যই হয়ে থাকেন। তাঁরাই হয়ে থাকেন নবীগণের নায়েব। মাখলুককে হেদায়েত করাই হয়ে থাকে তাঁদের দায়িত্ব ও পদমর্যাদা। তাই দ্বীনের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে তাদের বিরোধিতা করার কারো অধিকার নেই।

অতএব বুঝে নেওয়া চাই যে, বিদায়ের খুৎবা শরীয়তের দ্বারা একদম প্রমাণিত নয় এবং তা পড়ার ক্ষেত্রে বহু অসিদ্ধতা বিদ্যমান। তাই অবশ্যই তা বর্জন করা উচিত। রইলো এই বিষয়টা যে, লোকে অজুহাত পেশ করে থাকে যে, যদি খুৎবা না পড়া হয়, তাহলে অনেকেই নামাযে আসা ছেড়ে দিবে। এক্ষেত্রে অনুধাবন করা চাই যে, যেসব ব্যক্তি আল্লাহর জন্য নামায পড়ে, তারা সর্বাবস্থায় আসবে, চাই বিদায়ের খুৎবা পড়া হোক, চাই অন্য কোন খুৎবা পড়া হোক। আর যেসকল ব্যক্তি শুধু প্রথা ও রুসমের গুরুত্ব দেওয়ার জন্য আসে, এই খুৎবা ত্যাগ করার কারণে যদি না-ই আসে, না আসুক, তাদেরকে ডেকে আনার জন্য একটি বিদআতকে আমরা কেন বাড়াবো?

এক ব্যক্তি আমাকে বললো ঃ যদি ওয়াযে আপনি বিধবা মহিলাদের বিবাহ করার আলোচনা না করেন, তাহলে আমিও আসবো। আমি বললাম ঃ আজ তাহলে অবশ্যই সেই আলোচনা করবো। তোমার মন চাইলে আসবে, মন না চাইলে আসবে না। দ্বীন কারো আসা না আসার মুখাপেক্ষী নয়।

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

হযরত উমর (রাদিঃ)এর ইনসাফের ঘটনা

হযরত উমর (রাদিঃ)এর খেলাফতকালে জাবালা ইবনে আইহাম খাসসান নামের একজন বাদশাহ মুসলমান হয়েছিলো। হজ্জের যামানায় সে খানায়ে কা'বা তওয়াফ করছিলো। অন্য একজন গরীব মানুষও তার সাথে সাথে তওয়াফ করছিলো। হঠাৎ করে সেই গরীব মানুষের পায়ের নীচে তার লুঙ্গির কিনারা চাপা পড়েছে। এরপর যখন গাসসান সামনে বাড়লো তার লুঙ্গি খুলে গেলো এবং সে উলঙ্গ হয়ে গেলো। যেহেতু সে নিজেকে বড় মানুষ মনে করত আর অপর ব্যক্তিটি ছিল নেহায়েত গরীব মানুষ। এজন্য সে মারাত্মক ক্রোধান্বিত হলো এবং সেই ব্যক্তিকে এমন জোরে এক থাপ্পড় মারলো যে, লোকটির দাঁত ভেঙে গেলো। গরীব লোকটি সেই অবস্থাতেই হযরত উমর (রাদিঃ)এর খেদমতে হাযির হলো এবং আরয করলো যে, হে আমীরুল মুমিনীন! জাবালা আমার দাঁত ভেঙে দিয়েছে। হযরত উমর (রাদিঃ) বললেন ঃ জাবালাকে ডেকে নিয়ে এসো।

সুধীগণ! চিন্তা করুন, এটি পরীক্ষার জায়গা। একজন গরীব মানুষের মামলায় একজন বাদশাহকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যাইহোক। জাবালাকে নিয়ে আসা হলো। হযরত উমর (রাদিঃ) পুরো ঘটনা জিজ্ঞাসাবাদ করে গরীব লোকটিকে বললেন ঃ জাবালা থেকে তোমার বদলা গ্রহণ করো। জাবালা যখন এই কথা শুনলো, তখন মারাত্মক গোস্বার সাথে বললো ঃ হে আমীরুল মুমেনীন! হে মুসলমানদের সরদার! কোন্ জিনিসটি আমাকে আর একজন মামুলি বাজারী গরীব মানুষকে সমান করে দিলো? হযরত উমর (রাদিঃ) বললেনঃ ইসলাম। কেননা, ইসলামের বিচারে তো গরীব এবং আমীর সবাই সমান। তুমি তার দাঁত ভেঙে দিয়েছিলে, অবশ্যই তোমার দাঁত ভাঙা হবে।

দেখুন! এরই নাম দ্বীনী ভ্রাতৃত্ব। বর্তমানে একটি সময় চলছে যে, আমীর আর বিত্তবানদের জগতটাই এই দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন ও ভিন্ন একটি জগত। তারা গরীবদেরকে মানুষই মনে করে না। কিন্তু

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

অতীতকালেও যদি এই দ্বীনী ভ্রাতৃত্বের কোন নিদর্শন অবশিষ্ট থেকে থাকে, তাহলে তা আল্লাহওয়ালাগণের মাঝেই আছে।

হযরত মাওলানা গাঙ্গুহী (রহঃ)এর গরীব-মিসকীনদের প্রতি মহব্বত পোষণের কাহিনী

হযরত মাওলানা গাঙ্গুহী (রহঃ)এর ঘটনা হলো, একবার তাঁর কাছে একজন উচ্চপদস্থ লোক মেহমান হিসাবে আসলো। যখন খানা খাওয়ার সময় হলো, তখন হযরত তাকে নিজের সাথে বসালেন। যেহেতু উক্ত মেহমানকে নামী-দামী মানুষ মনে করা হতো, তাই অন্য গরীব মেহমানরা পিছনে সরে গিয়ে বসলেন। হযরত মাওলানা (রহঃ) বললেন—বন্ধুরা! আপনারা পিছনে কেন সরে গেলেন? আপনারা কি এজন্য সরে গিয়েছেন যে, একজন পদস্থ লোক আমার সঙ্গে বসেছে? ভালোভাবে বুঝে নিন, আপনারা আমার প্রিয়, আমার অন্তরে আপনাদের মর্যাদা ও সম্মান যতটুকু, কিছুতেই ততটুকু তার নেই। অতঃপর তিনি সকল গরীব তালিবে এলমদেরকে সঙ্গে বসিয়ে খানা খাইয়েছেন। হয়তো এ ঘটনা দ্বারা কারো এই সন্দেহ হতে পারে যে, মাওলানা তাঁর শান ও বড়ত্বকে প্রকাশ করার জন্যই এমন বলেছেন। ভালোভাবে বুঝে নেওয়া চাই যে, সেখানে শান ও বড়ত্বের কোন নাম-নিশানাও ছিলো না। যারা মাওলানাকে দেখেছেন, তারা তো ভালো করেই জানেন, কিন্তু যারা দেখেননি, তাদের জন্য একটি কাহিনী বয়ান করছি। যার দ্বারা বুঝা যাবে যে, মাওলানার কাছে অহংকার ও বড়ত্বের কোন লেশমাত্রও ছিল না।

একবার হযরত মাওলানা (রহঃ) হাদীস শরীফ পড়াচ্ছিলেন। আবহাওয়া মেঘাচ্ছন্ন ছিলো। হঠাৎ করেই বৃষ্টি পড়তে শুরু করলো। যতজন তালিবে এলম ছিলো, সকলেই কিতাব নিয়ে উঠে দৌড় লাগলো, যেন কিতাবাদি নষ্ট না হয়। তারপর তারা চালার নীচে গিয়ে দাঁড়ালো এবং কিতাবাদি রেখে জুতা উঠানোর জন্য ফিরে চললো। চত্বরের দিকে যখন মুখ করলো, তখন তারা কী দেখলো? দেখলো, হযরত মাওলানা (রহঃ) সকলের জুতা হাত দিয়ে একত্রিত করছেন। এ-ঘটনা দ্বারা

আপনারা হয়ত জানতে পেরেছেন যে, হযরত মাওলানা নিজেকে সামান্যতমও বড় মনে করতেন না। বরং তাঁর মাঝে ছিলো শুধু দ্বীনের মহব্বত ; যার ফলে তিনি গরীবদেরকে আমীদের চেয়ে সামান্য পরিমাণও তুচ্ছ জ্ঞান করতেন না। এ সমস্ত লোকের বরকতেই দুনিয়া চলছে। যেদিন এ ধরনের হযরতগণ থাকবেন না, সেদিন কেয়ামত চলে আসবে।

মোটকথা আগের ঘটনাটি ছিল হযরত উমর (রাদিঃ)এর জন্য পরীক্ষা। সামনে জাবালার পরীক্ষা। দেখা যাবে কী বুঝে সে ঈমান এনেছে? সে কি দুনিয়ার মর্যাদা ও সম্মানের জন্য একথা ভেবে ঈমান এনেছে যে, মুসলমানদের মর্যাদা তো বেড়ে চলেছে, চলো আমরাও মুসলমান হয়ে যাই, তাহলে আমরাও সম্মন ও মর্যাদা পাবো? নাকি শুধু খুদাকে সন্তুষ্ট করা এবং জান্নাতের প্রতিদান লাভের জন্যই ঈমান এনেছে? এমনই ভাবে কিছু কিছু লোক বুযুর্গগণের সাথেও এই উদ্দেশ্যে মিলিত হয় যে, লোকে তাকে সম্মান করে এবং তাকে বড় মনে করে, যদি আমরাও তার সঙ্গে থাকি, তাহলে আমরাও সম্মান পাবো। বহু লোক এভাবেই বুযুর্গগণের কাছে দলে দলে মুরীদ হয়ে থাকে।

কোন জোলা অথবা কলুর (তেলী) কাছে কেউ মুরীদ হয় না, চাই তিনি যত বড়ই বুযুর্গ হন না কেন। এর দ্বারা জানা যায় যে, আমাদের শুধু মৌখিক দাবীই সার, সাচ্চা তলবও নেই, যথার্থ মহব্বতও নেই। যেদিকে দেখলো যে, দুনিয়াবী উদ্দেশ্য পূরণ হয়, সেদিকে চারকদম বাড়িয়ে দিলো। আর যদি দেখে যে, এখানে দুনিয়াবী উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ার কোন সুরত নেই, তাহলে ধারে-কাছেও ভীড়ে না। এভাবেই লোকে পরীক্ষার সময় অকৃতকার্য ধরা পড়ে। অতঃপর জাবালার পরীক্ষা হলো এবং সে উত্তীর্ণ হলো না। অর্থাৎ সে তখন বললো ঃ ঠিক আছে, আমাকে একদিনের অবকাশ দেওয়া হোক। হযরত উমর (রাদিঃ) বললেন ঃ তুমি যার কাছে অপরাধ করেছ, সে যদি অবকাশ দেয় তাহলে অবকাশ পাবে, অন্যথায় নয়। সেই গরীব লোককে জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ তুমি কি অবকাশ দিবে? সেই বেচারা এমনই সুহৃদ মানুষ ছিলো যে, সঙ্গে সঙ্গেই অবকাশ দিয়ে দিলো। জাবালা সুযোগ পেয়ে রাতে উঠে পালিয়ে গেলো এবং রোমানদের মাঝে গিয়ে ভীড়ে গেলো। পুনরায় সে খ্রীষ্টান হয়ে

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

গেলো। দেখুন! দ্বীনের সাচ্চা তলব এবং মহব্বত তার অন্তরে ছিলো না; যে কারণে সামান্য অপমানের ভয়ে সে দ্বীন ত্যাগ করলো। যার ফল হলো চিরকালের জন্য লাঞ্ছনা। এদিকে হযরত উমর (রাদিঃ)কে দেখুন! তিনি ন্যূনতম পরোয়াও করলেননা যে, এই লোকটি আমীর আর অপর লোকটি গরীব। অন্যদিকে সেই লোকটিকে দেখুন! নিজের নফসের জন্য সামান্য কষ্টও সইতে পারেনি।

আল্লাহর অন্বেষণকারীর ধৈর্যশীল ও সহনশীল হওয়া অপরিহার্য

এমন বহু ব্যক্তি আছে, যারা শরীয়তের পাবন্দী করে শুধু দুনিয়ার উপকারের জন্যই। কিন্তু যারা আল্লাহ তাআলার সঠিক বান্দা, তাদের হালত এমন হয় যে, তাদের উপর দিয়ে কোন কিছু বয়ে গেলেও তারা হককে ছাড়তে পারেন না। দেখুন! যারা পরশ পাথর তালাশ করে তারা গোটা জীবন তার মাঝে বিলিয়ে দেয় এবং সবসময় একই চিন্তায় ডুবে থাকে।

কিন্তু আপনারা পরশপাথরের কোন অনুসন্ধানীকে দেখবেন না যে, সে তা থেকে সংকুচিত হয়ে গেছে এবং পরশ পাথরের সন্ধান করা ছেড়ে দিয়েছে। তাহলে কি খুদার অন্বেষণকারী, খুদার সন্ধানী পরশ পাথর সন্ধানীরও সমান নয়? ভালোভাবে বুঝুন, যে নিস্পৃহ ও অবসন্ন হয়ে গেলো, সে কোন অনুসন্ধানীইনয়, সে কোন তলবগারই নয়। তলবের রূপটাকে তলব বলা যায় না, যেমন মানুষের রূপকে মানুষ বলা যায় না।

রমযানের প্রথম অংশ রহমত মাঝের অংশ ক্ষমা, শেষ অংশ দোযক থেকে নাজাত

অতএব যে সকল লোক বিদায়–এর খুৎবা না হলে না আসে, তাদের না আসার কোন পরোয়াই করবেন না এবং এ ধরনের কাল্পনিক মসলেহাতের দ্বারা বিদআতসমূহের এজাযত দিবেন না। অবশ্য শা'বানের শেষ জুমার খুৎবা নিঃসন্দেহে সুন্নত। মূলত হুযূর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের খুৎবা পড়েছেন, যার একটি খণ্ডিত অংশ এটি (বয়ানের শুরুতে যা পাঠ করা হয়েছে)। এর মাঝে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মাসের বরকতসমূহ এবং সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্যসমূহ বয়ান করে বলেছেন যে, রমযান এমন একটি মাস যে, তার প্রথম অংশটি রহমত, দ্বিতীয় অংশটি গুনাহসমূহের ক্ষমাপ্রাপ্তি এবং শেষ অংশটি হচ্ছে আগুন থেকে মুক্তি। সুতরাং বুঝে নেওয়া চাই যে, এই যে কথাটি বলা হয়েছে যে, তার প্রথম অংশটি রহমত ; তার কারণ হলো, রহমত হচ্ছে মেহেরবানী বা দয়ার নাম। যেহেতু রমযানের প্রথম অংশে আল্লাহ তাআলা নেককাজ করার হিম্মত ও মনোবল বাড়িয়ে দেন এবং হিম্মত এমন একটি বিষয়, যা ব্যতীত কোন কাজ হয় না—তাই বলা হয়েছে রমযানের প্রথম অংশ রহমত। কেননা, হিম্মতের চেয়ে বড় আর কী মেহেরবানী হতে পারে! নেক কাজ-কর্মের হিম্মত আপনারা আগের তুলনায় অনেক বেশী লাভ করবেন তখন এবং এখান থেকে এই কথাটাও বুঝে নেওয়া চাই যে, কোন কোন মানুষ যে, সামান্য পরিমাণ নেক কাজ করে গর্বিত হয়ে যায়, এটা অত্যন্ত বুদ্ধিস্বল্পতার কথা, জ্ঞানস্বল্পতার ব্যাপার।

তাওফীক ব্যতীত কোন নেক আমলই হয় না

কেননা মানুষ যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোবল ও হিম্মত না পায় তাহলে কিছুই করতেই পারবে না। সুতরাং এটা আল্লাহ তাআলারই মেহেরবানী যে, তিনি আমাদেরকে নেককাজের হিম্মত দান করেন। মানুষের নিজের কোন যোগ্যতা বা কামাল রয়েছে বলে কেউ মনে করবেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে কিছু হিম্মত না হয়, মানুষ কিছুই করতে পারে না আর এটা আল্লাহ তাআলার এখতিয়ারভুক্ত। নচেৎ কী কারণ ছিলো যে, আবু লাহাব—যাকে অত্যন্ত সমঝদার ও বুদ্ধিমান মনে করা হতো এবং আত্মীয়তার সম্পর্কে যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হতো ; ঈমান আনার জন্য হুযূর (সাঃ) তাকে অনেক কিছু বুঝানোর পরও তার কালিমা পড়ার নসীব হয়নি। অন্যদিকে

হযরত বিলাল (রাদিঃ)কে দেখুন! তিনি ছিলেন হাবশার অধিবাসী। তাঁকে তেমন কোন বুদ্ধিমান মানুষও মনে করা হতো না। ইতিপূর্বে কখনো হুযূর (সাঃ)এর সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্যও তাঁর হয়নি। কেননা আরবে আসার পরই তিনি এক কাফেরের পিঞ্জিরায় আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং তিনি নিজে স্বাধীনও ছিলেন না। যার দ্বারা দ্বীনের কিছু কথাবার্তা জিজ্ঞাসা করে জেনে নেওয়ার সুযোগ পেতে পারতেন। উপরন্তু তাঁর ওপর ছিলো কষ্ট–ক্লেশের এমন দুঃসহ বোঝা যে, উত্তপ্ত পাথর তাঁর বুকের উপর রেখে দেওয়া হতো। কিন্তু এতসব কিছু সত্ত্বেও, তাঁর অবস্থা ছিলো এই যে, যবান থেকে শুধু এই কালিমাই বাহির হতো যে, 'আহাদ আহাদ' অর্থাৎ আল্লাহ্ এক, আল্লাহ্ এক।

আপনারা দেখলেন? একজনের সৌভাগ্যই হলো না কালিমা পড়ার। অথচ ধনসম্পদ, বিত্ত–বৈভব এবং বুঝ–বুদ্ধি–সবকিছুই তার ছিলো। পক্ষান্তরে অপরজনের ছিলো কষ্টের উপর কষ্ট ; তথাপি আল্লাহর নামই তাঁর মুখ থেকে বের হয়ে আসছিলো। আসলে এর কী কারণ ছিলো? কারণ এটাই ছিলো যে, আল্লাহ্ তাআলা আবু লাহাবকে হিম্মত দান করেননি আর হযরত বিলাল (রাদিঃ)কে দান করেছিলেন। বাস্তবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে মদদ না হয়, কিছুই হতে পারে না। এতদসত্ত্বেও এমন কথাবার্তা বলা যে, আমি এমন, আমি তেমন, এ নিতান্তই নির্বুদ্ধিতা ও বেওকুফীর বিষয়।

এক বুযুর্গের কাহিনী। তিনি পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। বাদশাহর বাড়ির নীচ দিয়ে যখন যাচ্ছিলেন তখন বাদশাহ তাঁকে তার সাথে সাক্ষাতের জন্য ডাকলেন। তিনি বললেন—কিভাবে আসবো, দরজা তো অনেক দূরে? তখন বাদশাহ সেখানে রশির সিঁড়ি ঝুলিয়ে দিলেন। বুযুর্গ তার সাহায্যে উপরে পৌঁছে গেলেন। সেখানে পৌঁছার পর আলোচনা শুরু হলো। কথায় কথায় বাদশাহ জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত কিভাবে পৌঁছলেন? বুযুর্গ জবাব দিলেন—যেভাবে আপনার কাছে পৌঁছলাম। অর্থাৎ আপনি যেভাবে রশির সিঁড়ি ফেলে আমাকে আপনার কাছে টেনে তুললেন, তেমনিভাবে আল্লাহ তাআলাও মহব্বতের সিঁড়ি ফেলে দিয়ে আমাকে টেনে নিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষেই

তিনি সত্য বলেছেন। আল্লাহ যখন টানেন তখনই কেউ তাঁর কাছে পৌঁছতে পারে।

দুআর মাঝে এই শর্ত না লাগানো চাই যে, আল্লাহ! আপনি যদি চান তাহলে কবুল করুন

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সকলেই উৎসর্গীত হয়ে যাই, কুরবান হয়ে যাই; কেননা তিনি বলেন, এভাবে দুআ করো না যে, হে আল্লাহ! যদি আপনি চান তাহলে আমাদের প্রতি দয়া করুন। অর্থাৎ দুআ এভাবে করো যে, হে খুদা! আমাদের প্রতি দয়া করুন। একথা বলা যে, যদি আপনি চান তাহলে দয়া করুন, এটা ঠিক্য নয়। এটা এজন্য যে, আল্লাহ তাআলার ওপর জোর–জবরদস্তি করার মত কেউ তো নেই–ই, তবে আর এ কথা বলার প্রয়োজন কি যদি আপনি চান, তাহলে এমন করুন? কারণ এর অর্থ তো এটা হয় যে, হয়তো আপনার কাছে আমি অন্যভাবে চাইলে আপনার ওপর চাপ সৃষ্টি হয়, আর এই চাপে আপনি আমার প্রয়োজন পূরণ করে দিয়ে থাকেন। তাই আমি আপনার ওপর চাপ সৃষ্টি করতে চাই না, বরং আপনার মন যদি চায় তাহলে আমার ওপর দয়া করবেন। অন্যথায় নয়। কেননা আপনার ওপর চাপ সৃষ্টি করায় আমি সন্তুষ্ট নই।

অতএব এটা তো বড় মারাত্মক বেয়াদবী হলো যে, আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে মনে করে বসছে যে,আমার বলার দ্বারা তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি হবে। বলুন! আল্লাহর ওপর মানুষের চাপ সৃষ্টি করা কিভাবে সম্ভব? আপনি দশহাজার বার চান এবং দুআ করুন। যদি তিনি চান কবুল করবেন। তাঁর ওপর কার জবরদস্তি চলবে? তথাপি আপনারা ভুল একটি শর্ত জুড়ে দিয়ে থাকেন যে, যদি আপনি চান তবে দয়া করবেন। আপনারাতো এটাই বলবেন যে, হে আল্লাহ! দয়া করুন। তাঁর ইখতিয়ার রয়েছে, দয়া করতেও পারেন, না–ও করতে পারেন। আমি সত্যই বলছি, যদি সারা দুনিয়ার জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানেরা একত্রিত হয়েও চিন্তা করতো তবুও কিছুতেই তারা এই বিষয়টা বুঝতে পারতো না, যা হযরত (সাঃ) বুঝে ফেলেছেন।

আল্লাহ তাআলা যখন বাধ্যবাধকতা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র, তখন যদি আপনাদেরকে তিনি রোযা রাখার, তারাবীহ পড়ার এবং কুরআন শরীফ পড়ার মনোবল না দিতেন তাহলে আপনারা কী করতে পারতেন? এজন্যই বলা হয়েছে যে, রমযানের প্রথম অংশ রহমত। কেননা রোযা রাখা, তারাবীহ পড়া এবং কুরআন শরীফ পড়ার হিম্মত ও মনোবল না দেওয়া বড়ই মেহেরবানী। সুতরাং যখন রমযানের প্রথম অংশে নেকী করার হিম্মত পাওয়া গেলো এবং নেককাজ শুরু করা হলো তবে গুনাহও মাফ হয়ে গেলো। রমযানের মধ্যম অংশ হলো গুনাহমাফের জন্য। এজন্যই হযরত (সাঃ) বলেছেন, রমযানের মাঝের অংশ ক্ষমা। এটা স্পষ্ট যে, গুনাহ মাফ হয়ে যাওয়ার দ্বারা মানুষ দোযখ থেকেও বেঁচে যায়। এজন্যই হুযূর (সাঃ) বলেন, রমযানের শেষ ভাগ দোযখ থেকে মুক্তি।

মোটকথা আজকের দিন--যা রমযানের শেষ দশদিনের একদিন—দোযখ থেকে মুক্তির খুশীর দিন। অতএব আমাদের পক্ষ থেকে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিত এজন্য যে, তিনি আমাদেরকে দোযখ থেকে নাজাত দিলেন। তার সাথে এ-ও বুঝে নেওয়া চাই যে, হুযূর (সাঃ) প্রথমে রহমত এবং গুনাহসমূহের ক্ষমার কথা বর্ণনা করেছেন। তারপর বয়ান করেছেন দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়ার বিষয়টিকে। অতএব প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থা দেখুন এবং চিন্তা করুন যে, তিনি রহমত এবং গুনাহসমূহের ক্ষমা পাওয়ার কাজ করেছেন কিনা? কেননা দোযখ থেকে নাজাত তখনই হবে যখন শুরুতে এমন কাজ করবেন, যার দ্বারা খুদার রহমতেও তিনি দাখিল হয়ে যান এবং তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

প্রতিটি আমলের সৌন্দর্য তখনই হাসিল হবে যখন আমলটি তার তরীকা অনুযায়ী করা হবে

অবশ্য কেউ যেন তারাবীহ এবং রোযার বাহ্যিক অবলম্বন করে তার বাহ্যিক অবয়ব থেকে এটা না বুঝে নেয় যে, আমি রহমত এবং ক্ষমার কাজ করে ফেলেছি। কেননা প্রতিটি কাজের সৌন্দর্য সেই সময়ই অর্জিত

হতে পারে, যখন সেই কাজকে তার তরীকা অনুযায়ী পালন করা হয়। হাদীস শরীফে রোযা সম্পর্কে এসেছে, যে ব্যক্তি মিথ্যা, ধোঁকায় লিপ্ততাকে ত্যাগ না করে তার খানাপিনা পরিহারে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ এমন রোযা আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না, যার মাঝে মানুষ হারাম জিনিস থেকে বিরত থাকে না। এখন খোদ প্রত্যেকেই দেখে নিক, সে আজ পর্যন্ত কিভাবে দিন অতিবাহিত করেছে। নামায পড়েছে, নাকি পড়েনি? আর পড়লেও যথার্থ পদ্ধতিতে পড়েছে, নাকি পড়েনি? দিনে আমাদের কেমন অবস্থা ছিলো? রাতে আমরা কী কাজ করেছি। কোন খারাপ জায়গায় তো চোখ ফেলিনি? কারো গীবত তো করিনি? মিথ্যা বলিনি তো? অতএব কোন ব্যক্তি যদি হিম্মত করে এবং সকল গুনাহসমূহ থেকে বেঁচে থাকে এবং যত নেককাজ ছিলো, সেগুলো যথার্থ পদ্ধতিতে করে তাহলে আজ তার জন্য বড়ই খুশীর দিন।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মনোবলের সাথে কাজ করেনি, তার আজ আফসোস করা উচিত। তবে যেসব ব্যক্তি আজ পর্যন্ত কিছুই করেনি তাদেরও নিরাশ হয়ে হাত–পা ভেঙে না বসে থাকা চাই। বরং এখনো অনেক সময় বাকী আছে। এ সময়েই যা কিছু হোক, করে নেওয়া চাই। আল্লাহ চাইলে তারও দোযখ থেকে নাজাত নসীব হয়ে যাবে। সেটা এমনই দরবার যে, সবসময় সেখানে রহমতের দরজা খোলা থাকে। কারো আগমনে কোন বাঁধা–প্রতিবন্ধকতা নেই। একই ভাবে সেখানে কারো আসা না আসার কোন পরোয়াও নেই। যার মন চাইবে, যখন চাইবে চলে আসবে, যে অবস্থায় চাইবে চলে আসবে। যখন সেখানে সর্বাবস্থায় আগমনের অনুমতি রয়েছে, তখন আপনি এটাও বুঝে নিন যে, কিছুসংখ্যক লোক যখন কোন হিন্দু অথবা খৃষ্টানকে মুসলমান বানায় তখন প্রথমে তাকে গোসল করিয়ে নেয় ; কোথাও কাউকে মুসলমান বানানোর ক্ষেত্রে এমন করা সঙ্গত নয়।

বন্ধুগণ! মুসলমান হওয়ার জন্য গোসল করারও প্রয়োজন নেই, ওযু করারও প্রয়োজন নেই। উপরন্তু যদি ইস্তেঞ্জা না করা হয়ে থাকে তবে ইস্তেঞ্জা থেকে ফারেগ হওয়ার জন্যও অপেক্ষা করবেন না। প্রথমে

মুসলমান বানিয়ে নিন। তারপর গোসল করান, পরিচ্ছন্ন করুন। এটাও তো একটি বিষয় যে, কে জানে এই ব্যক্তিটি চার মিনিট পরে জীবিত থাকবে নাকি মরে যাবে। অতএব মুসলমান বানানোর ব্যাপারে সামান্যও বিলম্ব করবেন না। কোন কোন ব্যক্তি এমনও গযব করে বসে যে, কাউকে মুসলমান বানানোর পর তাকে জুলাপ খাইয়ে পরিস্কার করার কথা বলে থাকে। আমি বলি, পাক হওয়ার জন্য যদি এটা জরুরী হয় যে, কুফুরির যুগের কোন জিনিসই অবশিষ্ট থাকতে পারবে না ; তখন তো শিঙ্গা লাগিয়ে রগ থেকে রক্তও বের করে নেওয়া উচিত। বরং গোশত আর চামড়াও নতুন হওয়া উচিত। মোটকথা অনর্থক সব বিবাদ লাগিয়ে রেখেছে। এই দরবারে যারই মন চাইবে, যখন চাইবে চলে আসবে, যে অবস্থায় চাইবে চলে আসবে।

বন্ধুগণ! ভেবে দেখুন, আজ এমন কোন বাদশাহ কি আছে যে, নাপাক ও অপরিচ্ছন্ন লোককে তার দরবারে ঢুকতে বাঁধা দেওয়া হয় না? মোটকথা হলো, আল্লাহর দরবারে আসতেও কাউকে বাঁধা দেওয়া হয় না, সেই দরবার থেকে চলে যেতেও বাঁধা দেওয়া হয় না। যার মন চাইবে চলে আসবে, যার মন চাইবে চলে যাবে। কাউকে এ পরিমাণ উপরে উঠানো হয়নি যে, সে সামান্যতমও গর্ব করতে পারে। সুতরাং অবস্থা যখন এই, তখন আমাদের নিরাশ না হওয়া চাই। হয়তো কখনো কেউ এমন বুঝে নিতে পারে যে, এখন তো সারাটা রমযান মাস প্রায় অতিবাহিতই হয়ে গেছে। এই অল্প দিন ইবাদত করার দ্বারা কিভাবে গুনাহ মাফ হবে? আজ আটাশতম রোযা চলছে। এখনো রমযান মাসের দু-একদিন বাকী আছে। শরীয়তের ওয়াদার ওপর ভরসা করে বলছি যে, যদি আপনারা চান এবং চেষ্টা করেন তাহলে আজই ক্ষমা হয়ে যাবে এবং মাত্র দুইদিনেই আপনাদের কাজ হয়ে যাবে। আপনারা যদি গুনাহর গাঁঠরি নিয়েও সেখানে যান তবুও সেখানকার এক ঝাপটাতেই সব ধুয়ে যাবে। দেখুন—সারা দুনিয়া জুড়েও যদি বরফের আস্তর পড়ে যায় তবে সূর্য উদয় হওয়ার সাথে সাথেই সব পানি হয়ে প্রবাহিত হয়ে যাবে। একইভাবে গোটা জগতও যদি গুনাহ দিয়ে ভরে যায় তবে সেদিকের একটি নযরই যথেষ্ট।

যাইহোক উদ্দেশ্য হলো এটা যে, যেই দুই দিন অবশিষ্ট রয়ে গেছে, সেই দুইদিনে নিজের কিছু ফিকির করে নেওয়া চাই। অতঃপর রমযানের পরে তো দুনিয়ার মাঝেই নিমগ্ন হয়ে যাবেন এবং সম্পূর্ণ চিন্তাহীন হয়ে যাবেন। কিন্তু যদি আল্লাহর রহমতের প্রতি দৃষ্টি দেন তাহলে একটি নিঃশ্বাসের জন্যও ওদিক থেকে উদাস ও চিন্তাহীন হবেন না। কেননা, আল্লাহ জানেন কোন্ সময় তিনি আমাদের প্রতি মেহেরবানীর দৃষ্টি দিবেন? যদি সেই সময় আমরা তাঁর থেকে বেফিকির হয়ে থাকি এবং দুনিয়ার মাঝেই আমাদের চিন্তা নিবদ্ধ থাকে তাহলে সেটা কেমন দোষ ও বিনাশের কথা হবে। তখন আফসোস করে বলবে যে, বড় সৌভাগ্যবশত সুযোগ এসেছিলো। তারপর আমাদের ভুলের কারণে তা হাত থেকে চলে গেছে। মিয়া! সেই দরবারে যারই কাজ হয়েছে, এক মুহূর্তেই হয়েছে। তাঁর এক মুহূর্তেরই মেহেরবানী আমাদের জন্য অনেক। কিন্তু আমরা এজন্যই বহুদিন ধরে লেগে থাকি যে, আমাদের জানা নেই—কোন্ মুহূর্তে মেহেরবানীর নযর পড়বে?

শাহ আবুল মাআলী এবং শাহভীক সাহেব (রহঃ)এর ঘটনা

শাহভীক সাহেব এবং শাহ আবুল মাআলী (রহঃ)এর ঘটনা। কোন কারণে শাহ আবুল মাআলী সাহেব শাহভীক সাহেবের প্রতি রাগান্বিত হলেন এবং তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। তিনি জঙ্গলে কান্নাকাটি করে ফিরছিলেন। বর্ষা এসে গেলো। হযরতের বাড়ী ভেঙে পড়লো। বিবি সাহেবা বললেন, একজন মাত্র মানুষ ছিলো, সেই–ই এইসব কাজ করে দিতো। আপনিই তাকে বের দিলেন। হযরত বললেন, হ্যাঁ আমি তো বের করেই দিয়েছি, তুমি ডেকে আনো। আমি তোমাকে তো বাঁধা দিচ্ছি না। বিবি সাহেবা শাহভীক সাহেবকে ডেকে পাঠালেন। শাহভীক সাহেবের তো ঈদ লেগে গেলো। খবর পেতেই তিনি এসে হাযির হলেন। বিবি সাহেবা ভেঙে পড়া বাড়ীর অবস্থা দেখালেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলে পৌঁছে কাঠ ও মাটি সংগ্রহ করে মেরামতে লেগে গেলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি সারাদিনে বাড়ী ঠিকঠাক করে দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং ছাদের উপর

মাটি ভাঙতে লাগলেন। এমন সময় হযরত শাহ আবুল মাআলী সাহেব (রহঃ) বাড়ীতে তাশরীফ নিয়ে আসলেন এবং খানা খেতে বসে গেলেন। এরপর ছাদের উপরে মাটিভাঙার আওয়ায শুনে তাঁর দয়ার জোশ এসে গেলো এবং তিনি উঠে আঙিনায় এসে দাঁড়ালোন এবং তাকে রুটির টুকরা দেখিয়ে বললেন, নাও। শাহভীক সাহেব ছাদের উপরেই লাফিয়ে উঠলেন এবং চিৎকার করে উঠলেন। হযরত লোকমা তার মুখে তুলে দিলেন এবং তাকে বুকের সঙ্গে লাগিয়ে নিলেন। বাস সবকাজ এক মুহূর্তেই হয়ে গেলো। এজন্যই তো বলি, এক মুহূর্তের জন্যও উদাসীন থাকবেন না। অবশ্য এতটুকু মনোবল যদি না থাকে তাহলে রমযানে রমযানে জাগ্রত থেকে ইবাদত করে নিন। এখন আছে আরো এক দুই দিন। এতটুকু সময়কেও অনর্থক খুয়াবেন না।

রমযানে উদাসীন থাকার ক্ষেত্রে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে মানুষকে ভীতি প্রদর্শন ও সতর্কীকরণ

সামান্য লক্ষ্য করুন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী বলেন? হাদীসে আছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন—লাঞ্ছিত হোক সেই ব্যক্তি, লাঞ্ছিত হোক সেই ব্যক্তি, লাঞ্ছিত হোক সেই ব্যক্তি—সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন—হুযূর! কোন্ ব্যক্তি লাঞ্ছিত হবে? হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ প্রথমত সেই ব্যক্তি যে আমার নাম শুনলো কিন্তু দরূদ শরীফ পড়লো না। দ্বিতীয়ত সেই ব্যক্তি, যার সামনে তার বৃদ্ধ মাতাপিতা জীবিত থাকে কিন্তু সে তাদের খেদমত করে জান্নাত কামাই করলো না। তৃতীয়ত সেই ব্যক্তি, যার সামনে দিয়ে রমযান শরীফ আসলো আর অতিবাহিত হয়ে গেলো, কিন্তু সে আগের মতই গুনাহগার থেকে গেলো। নেকীর কাজ করে নিজের গুনাহ ক্ষমা করাতে পারলো না।

বন্ধুগণ! চিন্তা করুন, হুযূর (সাঃ) সেই ব্যক্তিকে অভিশাপ দিচ্ছেন। হুযূরের অভিশাপ আল্লাহর অভিশাপের নামান্তর। যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা অভিশাপ দেন, তার ঠিকানা কোথায় হতে পারে? এখন চিন্তা করুন, যদি গুনাহসমূহের ক্ষমাপ্রাপ্তি চান আল্লাহ তাআলার নিকট

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

নিজের গুনাহসমূহের ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

ক্ষমা করানোর তরীকা এটা নয় যে, তসবীহ হাতে নিয়ে শুধু তওবা তওবা পড়তে শুরু করে দিয়েছে। বরং এটাও করুন এবং তার পাশাপাশি হকদারদের হকও আদায় করে দিন। যদি কারো কাছে অন্যের জমি থাকে, জোরপূর্বক দখল করাই হোক কিংবা মৌরুসীই [উত্তরাধিকারের সম্পত্তি] হোক, সেই যমীন ছেড়ে দিন। কারো ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করে দিন। মানুষ হয়তো মনে মনে বলে যে, মৌরুসী যমীন ছাড়ার কথা তো বললেন? কিন্তু পরে আমরা খাবো কোত্থেকে? কিন্তু বন্ধুগণ! চিন্তা করুন, যদি কারো মৌরুসী ক্ষেতের ওপর দিয়ে কোন রেল লাইন চলে যায় এবং তার সব ক্ষেতই রেলের অধীনে চলে আসে এবং মূল্য চলে যায় যমীনদারের কাছে তাহলে কী করবে? কোত্থেকে খাবে?

বড়ই আফসোসের কথা যে, দুনিয়ার বাদশাহদের হুকুম তো আমরা ওযর ছাড়া মেনে নেই, কিন্তু আল্লাহ তাআলার যেই হুকুম হয়, তাতে আমরা অবহেলা করি। আসল কথা হচ্ছে মানুষের অন্তরে ইসলামের কোন কদরই নেই। অন্যথায় ইসলামের যেসব হুকুম রয়েছে সেগুলোরও অবশ্যই কদর করতো। ব্যাপার হচ্ছে এই যে, বিনা কষ্টে পেয়ে গেছে এবং তার উপকার ও কল্যাণও দেখতে পাচ্ছে না। এ কারণেই ইসলামের কোন কদর বুঝেনি। ইসলামকে পাওয়ার ক্ষেত্রে তো কোন অর্থকড়ি খরচ করতে হয়নি, তাই তাদের অন্তরে সেই ইসলামের কদর কিভাবে হয়?

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন—তারা আল্লাহ তাআলার তেমন কদর করেনি, যেমন কদর করা দরকার ছিলো। দুনিয়ার বাদশাহ তো তখনই খুশী হয় যখন অনেক চেষ্টা ব্যয় করা হয় এবং বহু টাকা পয়সা খরচ করা হয়। অপরদিকে আল্লাহ তাআলাকে দেখুন, খুব সহজেই সন্তুষ্ট হয়ে যান। তথাপি আমরা তাঁকে সন্তুষ্ট করার ফিকির করি না। অথচ বাস্তবে এটা মারাত্মক নীচুতা ও অসভ্যতা। কেননা, মানুষের উচিত নিজের ওপর যার অবদান-অনুগ্রহ সবচেয়ে বেশী হয় তার সামনে নেহায়েত অক্ষমতা ও বিনয়ের সাথে পেশ হবে এবং তার নির্দেশ মানবে; এটা নয় যে, উল্টো তার সাথে অনিষ্টকর আচরণ করবে এবং তার কথা ও নির্দেশের বিপরীত চলবে।

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

মৌরুসী বা উত্তরাধিকারের সম্পদ আটকে রাখা হারাম

অতএব নিজের অল্প-বিস্তর কষ্টের কোন পরোয়াই করবেন না। যদি কারো কাছে মৌরুসী যমীন থাকে তাহলে তার উচিত অতিসত্বর ছেড়ে দেওয়া। বরং আমি বলি—যে ব্যক্তি মৌরুসী ভূমি ছেড়ে দিবে সে বেশী আরামে থাকবে। কারণ, এতে সে ঈমানদার রূপে মশহুর হয়ে যাবে। লোকে বলবে—দেখো কেমন ঈমানদার, নিজের মৌরুসী যমীন ছেড়ে দিয়েছে। এরপর প্রত্যেক যমীনদারই এই চেষ্টা করবে যে, আমাদের যমীনও এই লোকই চাষ করুক। এখনও যদি বিষয়টি লোকজন না বুঝে এবং না মানে তাহলে তারা জেনে রাখুক যে, সাহারানপুর জেলার দু'জন লোক আমার কাছে এসেছে। ঘটনাচক্রে আমি ভীসানী নামক স্থানে গিয়েছিলাম। তারা সেখানে গিয়ে আমার সাথে দেখা করলো। তারা বললো, আমাদেরকে মুরীদ বানিয়ে নিন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—তোমাদের কাছে মৌরুসী জমি নেই তো? তাদের কথায় জানতে পারলাম—আছে। আমি তাদেরকে বললাম, সেই জমি ছেড়ে দাও। তারা বলতে লাগলো—প্রথমে মুরীদ করে নিন, এরপর ছেড়ে দেবো। আমি বললাম—প্রথমে ছেড়ে আসো। কিন্তু আজও পর্যন্ত তারা আর আসেনি। একটি গ্রামের লোক দীর্ঘকাল ধরে আমাকে তাদের ওখানে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। কিন্তু তাদের ওখানে আজ পর্যন্ত এজন্য যাইনি যে, সেখানে সবার কাছেই মৌরুসী জমি রয়েছে। আমি তাদেরকে বলেছি, এ কথাটা বলো যে, আমাকে রুটি খাওয়াবে কোত্থেকে? বাস, তারা এর জবাব দিতে পারেনি।

হাদীসে আছে, যদি একটি টাকা হয় হারামের, আর নয়টি টাকাই হয় হালাল, তাহলে শুধু সেই একটি হারাম টাকা মিশে যাওয়ার দ্বারা সমস্ত ইবাদতই গারত হয়ে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে। উপরন্তু গযবের কথা হলো, মানুষ বিবি-বাচ্চার জন্য হারাম কামাই করে থাকে, এমনও নয় যে, শুধু নিজের জন্যই এমন করছে। কিন্তু এর দ্বারা কেউ এটা বুঝে নিবেন না যে, তাহলে আর রোযা-নামায করে কী করবো? কেননা, আমাদের কাছে তো হালাল জীবিকাই নেই। হালাল জীবিকাই যখন নেই

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

তবে তো রোযা–নামায কিছুই কবুল হবে না। তবে আর নামায–রোযা দ্বারা ফায়দা কী? মনে রাখবেন—এখন তো শুধু একটি গুনাহ যে, হারাম মালে পেট ভরেছে। যদি নামায–রোযা এবং অন্যান্য নেকীর কাজ ছেড়ে দেন তাহলে গুনাহ আরো অনেক হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় বিষয় ঈদ সম্পর্কে

এই বিষয়টি ছিলো রমযানের আলোচনা সম্পর্কে। এখন ঈদ প্রসঙ্গে কিছু বয়ান করছি। এই হাদীসের সাথে ঈদেরও সম্পর্ক রয়েছে। সেই সম্পর্কটি হলো এই যে, রমযানের শেষ ভাগ সম্পর্কে হুযূর (সাঃ) বলেছেন যে, তার দোযখ থেকে নাজাত। প্রথমে এই কথাটি বয়ান করা হয়েছে যে, দোযখ থেমে মুক্তি তখনই হয় যখন তার পূর্বে রহমত এবং পাপ ও গুনাহ থেকে ক্ষমাও ঘটে। এর দ্বারা জানা গেলো যে, রমযানের শেষভাগে রহমত থাকে, গুনাহ থেকে ক্ষমা এবং দোযখ থেকে নাজাতও থাকে। উপরন্তু কুরআন শরীফে আছে, আল্লাহ তাআলার মেহেরবানী এবং তাঁর রহমতের সাথে খুশী হও। এর দ্বারা জানা গেলো, এই সময় ও পরিস্থিতিতে খুশী হওয়া উচিত। তাছাড়া হাদীসেও আছে যে, রোযাদারের জন্য দুইটি খুশী রয়েছে। একটি হলো, রোযা খোলার (ইফতারের) সময়টা হচ্ছে খুশীর সময়। দ্বিতীয়টি হলো, যখন রোযাদার তার রবের সাথে মুলাকাত করবে। এই হাদীস দ্বারা জানা হলো যে, রোযা খোলার সময়টা খুশীর সময়। রোযা খোলাটা দু'রকম। একটি ছোট, যা প্রতি রোযার দিনে ইফতারের সময় হয়ে থাকে। দ্বিতীয়টি বড়। এটি হলো, রমযান সমাপ্ত হওয়ার পর যে রোযা খোলা হয়, সেটি। যার সবগুলি রোযা পূর্ণ হয়ে যায়, সেজন্য যে খুশী তার জাগে, তারই নাম ঈদ।

ঈদের রাতে একদম না খাওয়ার ভিত্তি

আমাদের জাহেল ভাইয়েরা নতুন একটি মাসআলা বের করেছে যে, ঈদের রাতে (চাঁদ রাতে) তারা কিছুই খায় না। যখন সকাল হয়ে যায় তখন কিছু খেয়ে নেয় এবং বলে রোযা খুলে ফেলো। রুসমটাকে আমি

আমাদের শৈশবকাল থেকেই দেখে আসছি। তাহকীক যতটুকু করেছি তাতে এর শুধু এতটুকু ভিত্তি পাওয়া গেছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিলো যে, ঈদের দিন সকালে তিনি কিছু খেয়ে নিতেন, তারপর নামাযে যেতেন, যেন লোকজন জানতে পারে যে, আজ রোযা নয়। অর্থাৎ হুযূর (সাঃ) এই ভয়ে এমনটি করতেন যে, কেউ যদি রোযা রেখে ফেলে। সুতরাং সারারাত না খেয়ে থেকে সকালে রোযা খোলার এই আমলটি সঠিক নয়। কেননা, আল্লাহ তাআলা সীমানা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যে, মাসের শুরু থেকে তার শেষ পর্যন্ত রোযা রাখুন। এখন আর এই সীমানা থেকে সামনে বাড়া দুরস্ত নয়। এ কারণেই রমযানের একদিন পূর্ব থেকে রোযা শুরু করে দেওয়া মাকরূহ এবং ঈদের দিন রোযা রাখা হারাম।

ঈদের দিনে আমাদের ওপর খুশী উদযাপনের হুকুম বিদ্যমান

মোটকথা এই যে, ঈদ এমন একটি সময়কাল, যে সময়কালে আমাদের উপর হুকুম রয়েছে আনন্দ করার। কিন্তু যেহেতু এই আনন্দটা দ্বীনের, তাইএই আনন্দ–স্ফূর্তি এমন পন্থায় করা চাই, যে পন্থা দ্বীন আমাদেরকে শিখিয়েছে। বিষয় হচ্ছে এই যে, আনন্দ দু' ধরনের হয়ে থাকে। একটি দুনিয়ার আনন্দ, অপরটি দ্বীনের আনন্দ। অতএব আমরা যদি দ্বীনের আনন্দ বিশেষ কোন পন্থায় করতে চাই, তাহলে আমাদের উচিত নয় নিজেদের মতামত ও সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পন্থা তৈরী করা বরং দেখা চাই যে, শরীয়ত ও আমাদেরকে সেই পন্থা অনুযায়ী আনন্দ করার অনুমতি দিয়েছে কিনা। হাঁ যদি দুনিয়ার আনন্দের ব্যাপার হয়, তাহলে অবশ্য নিজেদের রায় অনুযায়ী করে নেওয়ার দ্বারা কোন ক্ষতি নেই। তবে, তাতে কোন গুনাহ থাকতে পারবে না। অন্যথায় সেটাও বৈধ নয়। বর্তমানে কোন কোন ভাইয়েরা হিন্দুস্থানে একটি নতুন ফাসাদের বিষয় বাহির করেছেন। সেটা হলো এই যে, তারা চেষ্টা করছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের দিনেও যেন ঈদ উদযাপন করা হয়। এই চিন্তাটা তাদের মনে এ জন্য এসেছে যে, তারা অন্যান্য

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

জাতিকে দেখেছে যে, তারা তাদের ধর্মের মহাপুরুষদের প্রতি এই আচরণটিই করে থাকে। কিন্তু বুঝা উচিত যে, হযরতের জন্মের দিনের আনন্দ দুনিয়ার আনন্দ নয়, যা নিজেদের মতামত ও রায়ের মাধ্যমে করে ফেলবো। বরং এটা দ্বীনের আনন্দ। তাই এই আনন্দের জন্য আমরা সেই পন্থাই নির্ধারণ করতে পারি যেই পন্থার প্রতি দ্বীনেরও অনুমোদন রয়েছে ; নিজেদের রায়ে আমরা কোন পন্থা বা তরীকা উদ্ভাবন করে নিতে পারিনা। যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, আমরা বর্ষপূর্তি হিসাবে এই আনন্দটি করে থাকি যেমন দুনিয়ার অপরাপর আনন্দ আমরা করি ; তাহলে আমি বলবো—এমনটি করা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মারাত্মক বেয়াদবী। ভাইগণ! হুযূর (সাঃ)কে কি আপনারা দুনিয়ার বাদশাহদের মত মনে করে বসেছেন যে, তাঁর জন্মের আনন্দের জন্য এই তুচ্ছ দুনিয়ার আয়োজন করছেন, যেমন করা হয়ে থাকে বাদশাহদের জন্য ?

এক বুযুর্গের কুকুরী বাচ্চা জন্ম নেওয়ায় দুনিয়াদারদেরকে দাওয়াত করা এবং এক বুযুর্গকে দাওয়াত না করা

এ পর্যায়ে এক বুযুর্গের একটি কাহিনী আমার মনে পড়েছে। তিনি থাকতেন জঙ্গলে। একটি কুকুরী পালতেন। ঘটনাচক্রে একবার সেই কুকুরী বাচ্চা প্রসব করলো। তখন তিনি গোটা শহরের মান্যগণ্য লোকদেরকে এবং দুনিয়াদারদেরকে দাওয়াত করলেন। কিন্তু শহরে এক বুযুর্গ থাকতেন, তাঁকে দাওয়াত করলেন না। সেই বুযুর্গ অকৃত্রিমভাবে বন্ধুসুলভ অনুযোগ করলেন, ভাই! আমাকে তো দাওয়াত করলেন না?' তখন সেই দাওয়াতকারী বুযুর্গ উত্তর দিয়ে পাঠালেন—হযরত আমার এখানে কুকুরী বাচ্চা প্রসব করেছে, সেই আনন্দে দুনিয়ার কুকুরদেরকে দাওয়াত করেছি। এটা বড়ই বেয়াদবী হতো, যদি দুনিয়ার কুকুরদের সাথে আপনাকেও দাওয়াত করতাম। যেদিন আমার সন্তান হবে এবং আমি আনন্দিত হবো সেদিন আপনাদের দাওয়াত করবো এবং এই কুকুরদের একজনকেও ডাকবো না। মোটকথা আমরা যে আচরণ দুনিয়াদারদের

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

সাথে করি, সেই আচরণ বুযুর্গগণের সঙ্গে করা বেয়াদবী। তাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যদি সেই আচরণই করা হয় তাহলে সেটা কিভাবে বেয়াদবীর অন্তর্ভুক্ত হবে না? এখন এটা অনুধাবন করুন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের দিনটি দুনিয়ার খুশী কিভাবে হবে?

শুনুন! যদি এটি দুনিয়ার খুশী হতো তাহলে তার খুশী যমীনের উপরে উপরেই হতো। কিন্তু এমন তো হয়নি। হুযূর (সাঃ)এর জন্মের খুশী যমীনের কী মানে, আকাশের উপরও হয়েছে। যেদিন হুযূর (সাঃ)এর জন্ম হয়েছে সেদিন আরশ–কুর্সি এবং ফেরেশতা প্রত্যেকেরই খুশী ছিলো। অতএব এটা দুনিয়ার খুশী হলো না, এটা দ্বীনী খুশী হলো। তাই এই খুশী সম্পর্কে আমাদেরকে সবদিক থেকে শরীয়ত থেকেই জানা উচিত। এখন আমরা সেইসব লোককে জিজ্ঞাসা করি যারা এই দিনটিকে ঈদ বানাতে চায়, কোন্ আয়াত কিংবা কোন্ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, এই দিনেও ঈদ করা চাই। যদি এটা শরীয়তের কথা হতো তবে সাহাবায়ে কেরাম অবশ্যই জানতেন। কারণ, তাঁরা তো হুযূর (সাঃ)এর সোহবতে থেকেছেন। তাঁদের চেয়ে বেশী আর কে মাসআলা জানতে পারেন? এবং হুযূরের মহব্বত তাঁদের সমান আর কার অন্তরে থাকবে? তাহলে কারণ কি যে, তাদের কারো মনেই একথা জাগেনি, কারো অন্তরেই এ কল্পনা আসেনি যে, এই দিন ঈদ করা চাই। হাঁ, হুযূর (সাঃ)এর পক্ষ থেকে যে বিষয়গুলোর অনুমতি পাওয়া যায় তা অবশ্যই করা চাই।

হাদীসে আছে যে, তিনি তাঁর জন্মের দিন রোযা রেখেছেন এবং বলেছেন যে, এটা সেই দিন, যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি। এজন্যই আমাদেরও এইদিনে রোযা রাখা মুনাসিব ও সঙ্গত। যেমনিভাবে জন্মের দিনে নিজেদের পক্ষ থেকে গড়ে আনন্দের কোন তরীকা না বানানো চাই, তেমনিভাবে ওফাতের দিনেও নিজেদের পক্ষ থেকে কোন বিষয় না সৃষ্টি করা উচিত, যদিও সেই দিনটিও হয়ে থাকে বুযুর্গগণের জন্য খুশী ও আনন্দের দিন। এ থেকে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন যে, কিছু সংখ্যক ব্যক্তিবর্গ যে বুযুর্গগণের উরস করার পন্থা উদ্ভাবন করে নিয়েছে,

এটা নিতান্তই অসঙ্গত ; বরং এটা আসলে শরীয়তের সীমানা থেকেই বাহির হয়ে যাওয়া। এর ভিত্তি শুধু এতটুকুই যে, উরসের অর্থ হলো খুশী। বুযুর্গগণের ওফাত তাদের জন্য বড়ই খুশী ও আনন্দের জিনিস। কেননা, তারা তো এই জীবনের বন্দিত্ব থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের মাহবুব–প্রেমাস্পদের কাছে গিয়ে হাযির হন। তাই তাদের জন্য এর চেয়ে বড় খুশী আর কী হতে পারে? এ জন্যই তাদের ওফাতের দিনকে উরস বলা হয়। বুযুর্গগণ কখনো কখনো দুনিয়াতেও তাঁদের মাহবুব আল্লাহর সাক্ষাত লাভ করে থাকেন। কিন্তু মৃত্যুর পর যে বেসাল বা সাক্ষাত নসীব হয়, তার তুলনায় দুনিয়ার এই সাক্ষাতের কী অবস্থান? এই দুই সাক্ষাতের মাঝে বড় পার্থক্য এটা যে, এখানে সাক্ষাত হিজাবের সাথে হয়ে থাকে আর মৃত্যুর পরে হয় বিনা আবরণে, বে–হিজাব। এজন্যই তারা এর আকাংক্ষা করে থাকেন এবং মৃত্যুকালেও প্রশান্ত থাকেন।

নকশবন্দী তরীকার এক বুযুর্গের কাহিনী। তিনি অসিয়ত করে গেলেন, যখন আমার জানাযা নিয়ে যাবে, তখন এক ব্যক্তি কবিতা পড়তে পড়তে সাথে চলবে। কী ভাই! প্রশান্তিহীনতার মাঝে কেউ কি এমন ফরমায়েশ করার সুযোগ পায়? কিছুতেই নয়, বরং এমন কথা খুশীর মধ্যেই বলা সম্ভব।

হযরত সুলতান নিযামুদ্দীন আউলিয়া কুদ্দাসা সিররুহুর কাহিনী মশহুর। যখন তাঁর ইন্তেকাল হলো এবং জানাযা নিয়ে সবাই চললো, তখন এক মুরীদ তীব্র ব্যথা ও শোকের কারণে কিছু শে'র পড়লেন। বাস, হযরত সুলতানজী সাহেবের হাত কাফনের মধ্যেই উপরে উঠে গেলো। এটা আনন্দের হালত না হলে আর কী? বাস্তবেই এ দিনটিতে বুর্যুগণ বড়ই আনন্দিত হয়ে থাকেন। তাঁদের আনন্দের সামান্য কারণও এটা নয় যে, হুর ও জান্নাতের প্রতি তাঁদের লোভ ও আগ্রহ থাকে, বরং তাঁরা থাকেন এর অপেক্ষায় যে, কখন মাহবুব প্রেমাস্পদ খুদার দীদার নসীব হবে।

হযরত উমর ইবনুল ফারেয (রহঃ) এর ঘটনা লিখা হয়েছে যে, যখন তাঁর ইন্তেকাল হচ্ছিলো, তখন চোখে জান্নাতের দৃশ্য ভেসে উঠলো। তিনি

সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন—মহব্বতের ক্ষেত্রে আমার মর্যাদা যদি আপনার কাছে এটাই হয় যা আমার দৃষ্টিতে এলো, তাহলে আমার দিন বেকার গেলো। অর্থাৎ জানটাতো আমি দিচ্ছি আপনার জন্য, জান্নাত দিয়ে আমি কী করবো? শেষ পর্যন্ত জান্নাতের দৃশ্য সরে গেলো এবং আল্লাহ তাআলার নূর দৃষ্টিতে ধরা পড়লো। বাস্ তখনই তাঁর ওফাত হয়ে গেলো। বহু লোক এইসব অবস্থার কথা শুনে অবাক হয়ে যান। কিন্তু এই আশ্চর্যবোধ এজন্য যে, নিজেরা এসব অবস্থা থেকে মাহরূম। এজন্যই তাদের উচিত এইসব বিষয়কে অস্বীকারও না করা। মোটকথা বুযুর্গগণের ওফাতের দিনটি তাঁদের জন্য ছিলো আনন্দের দিন। কিন্তু এখন লোকেরা তার মাঝে এমন সব দোষ ও অসিদ্ধতা সৃষ্টি করে ফেলেছে যে, যার কোন পরিসমাপ্তি নেই। বিয়ে-শাদীর সব ব্যবস্থা একত্রিত করে ফেলেছে। বহু জায়গায় রুসম রয়েছে যে, বুযুর্গগণের কবরের উপর তাঁবু টানানো হয়, ঢোল-তবলা রাখে। এমনিভাবে সেতারা বাদ্য সহ সব অনর্থক জিনিস জমা করে রাখা হয়েছে। গরীব মুর্দারের ক্ষেত্রে এসবের সুযোগ ঘটে না, তার জন্য কবরের গীত বানানো হয়।

হাদীস শরীফে আছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, আমার কবরকে ঈদ বানিয়ো না। ঈদের মাঝে তিনটি জিনিস অবশ্যই ঘটে থাকে। এক—লোকজনের সমাগম। দ্বিতীয়—বিশেষ দিন নির্ধারিত হওয়া, তৃতীয়—আনন্দ। তাই হাদীসের মর্ম এটাই হলো যে, আমার কবরের ওপর কোন বিশেষ দিনে আনন্দের আয়োজন নিয়ে সমবেত হবে না। হাঁ, ঘটনাচক্রে যদি কখনো লোকজনের সমাগম ঘটে যায় এবং এমন নিয়ত না থাকে তাহলে কোন ক্ষতি নেই। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে এই যে, হযরতের ওফাত যদিও হযরতের জন্য খুশী ও আনন্দের ব্যাপার, কিন্তু আমাদের জন্য তো তা একধরনের ব্যথা ও দুঃখেরই ব্যাপার। তাহলে এই দিনটি খুশীর হবে কিভাবে? সর্বোপরি, যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের কাছে এভাবে একত্রিত হওয়া দুরস্ত নেই, তখন অন্যদের কবরের কাছে এভাবে একত্রিত হওয়া এবং নানাধরনের আনন্দ ও খুশী উদযাপন করা কিভাবে দুরস্ত হবে? এবং বিস্ময়কর বরকতের ব্যাপার যে, হুযূর

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আজ পর্যন্তও কোন বিশেষ দিন একত্রিত হওয়ার জন্য নির্ধারিত হয়নি।

মোটকথা হলো, আমাদের ওপর হুকুম রয়েছে যে, যখন বড় ইফতার করবে, সেই দিনটিতে ঈদ করবে এবং তখন এই ব্যাপারগুলো হওয়া চাই যে, পরস্পরে মুলাকাত করবে, আনন্দ করবে, অনেক দান-খয়রাত করবে,সবাই একত্রিত হয়ে ঈদগাহে দুই রাকাত নামায পড়বে।

বন্ধুগণ! চিন্তা করে দেখুন—আল্লাহ তাআলা আমাদের আনন্দ করার কত সুন্দর তরীকা নির্ধারিত করে দিয়েছেন! সেখানে নামাযের হুকুম করেছেন, প্রাণখুলে দান-খয়রাত করার আদেশ দিয়েছেন। সেদিনের নামাযও আবার প্রতিদিনের মত নয়, সেখানে তাকবীরের সংখ্যা অধিক করে দিয়েছেন, যেন ঈদের নামাযে এবং প্রতিদিনকার নামাযে এক ধরনের ব্যবধান ও পরিচিতি চিহ্নিত হয়ে যায়। আপনারা শরীয়তের সৌন্দর্য দেখুন! মানুষের মাঝে দুটি বস্তু বিদ্যমান—একটি দ্বীন, আরেকটি তবীয়ত এবং যেভাবে তবীয়তের মধ্যে জোশ সৃষ্টি হয়, তেমনিভাবে দ্বীনের মাঝেও জোশের সৃষ্টি হয়। তাই আল্লাহ তআালা দ্বীনের জোশ ও আবেগের ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলা এই করেছেন যে, সেদিন উত্তম থেকেও উত্তম কাপড় পরার অনুমতি দিয়েছেন। দেখুন, শরীয়তের কেমন পবিত্র আয়োজন! আফসোস এই শরীয়তকে লোকেরা ভয়ানকরূপে প্রকাশ করেছে এবং মানুষকে এই শরীয়ত সম্পর্কে ভীত করে তুলেছে যে, মানুষ এই শরীয়ত থেকে দূরে দূরে থাকতে শুরু করেছে। অন্যথায় এই শরীয়ত তো আশ্চর্য চিত্তাকর্ষক বিষয়!

যা বয়ান হয়েছে, এটি ছিলো ঈদের হুকুম। অবশিষ্ট আরো কিছু ঈদের হুকুম আলোচনা হচ্ছে, যা বহুবার বয়ান করা গেছে। যেমন চাঁদ দেখার চেষ্টা করা, চাঁদের খবর গ্রহণ করায় সতর্কতা অবলম্বন করা, সত্য-মিথ্যা সব খবরকেই গুরুত্ব না দেওয়া ইত্যাদি। তবে এ মুহূর্তে সদকায়ে ফিতর সম্পর্কে এতটুকু বয়ান করছি যে, যার কাছে নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পঞ্চাশ টাকার (এটি তৎকালীন টাকার মান ও হিসাব অনুযায়ী) মাল রয়েছে, সদকায়ে ফিতর তার ওপর ওয়াজিব। নিজের পক্ষ থেকেও সে দিবে, দিবে নিজের ছোট বাচ্চাদের পক্ষ থেকেও।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

প্রত্যেকের পক্ষ থেকে পাক্কা মাপের পৌনে দুই সের গম গরীব–মিসকীনদের দিয়ে দিবে। তবে, যা কিছু দিবে তা কারো বেতন বাবদ দিবে না। যদি কারো বেতন আপনার দায়িত্বে থেকে থাকে আর আপনি তাকে সদকায়ে ফিতর দিয়ে দেন তবে আপনার দায়িত্ব থেকে সদকায়ে ফিতর আদায় হবে না। বরং পুনরায় আপনার সদকায়ে ফিতর দিতে হবে। হাঁ ঈদের দিনের আরো একটি সৌন্দর্যের কথা স্মরণে এসেছে।

হাদীসে এসেছে, মানুষ যখন ঈদের মাঠে একত্রিত হয়ে যায় তখন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাগণকে বলেন যে, যেই শ্রমিক উত্তমভাবে তার কাজ সমাপ্ত করেছে তাকে কি বিনিময় দেওয়া উচিত? ফেরেশতাগণ আরয করেন—তার বিনিময়ে সেই শ্রমিককে পুরোপুরি পারিশ্রমিক দিয়ে দেওয়া উচিত। তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার প্রতাপ ও মর্যাদার কসম! আজ আমি তাদের ক্ষমা করে দিচ্ছি।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলা এবং ফেরেশতাগণের কথোপকথন বর্ণনা করার পর বলেছেন—অতঃপর লোকেরা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে আসে। অতএব এই হাদীসটি শোনার পর আপনাদের ভেবে–চিন্তে দেখতে হবে ঈদগাহে কেমন আকৃতি নিয়ে যাওয়া উচিত? এমন আকৃতিতে যাওয়া উচিত যে, তাঁর মেহেরবানী পাওয়ার উপযুক্ত হতে পারেন। আফসোসের ব্যাপার হলো, অধিকাংশ লোক আকৃতিটাও গুনাহগারের বানিয়ে যায়। যেসব লোক দাড়ি কামায় অথবা কাটে, তাদের অবশ্যই উচিত আজ থেকেই তওবা করে নেওয়া। সবসময়ের জন্য যদি সম্ভব না–ও হয় অন্তত ঈদ, বকরে ঈদ অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত তা থেকে বেঁচে থাকা চাই। কারণ এ সময়টাতে বড় উপস্থিতি ঘটে থাকে। আমি বলি, দাড়ি যদি না কামানো হয় তাহলে কোন ক্ষতি যেমন নেই, তেমনি দাড়ি কামালে কোন কল্যাণ ও উপকারও তো হয় না। তথাপি এই অনর্থক গুনাহ করে কী লাভ? অহেতুক আচরণের কারণে আল্লাহর সামনেও লাঞ্ছিত হলো, দুনিয়াতেও কোন সুখ ও মজাও লাভ করতে পারলো না। একইভাবে কিছু লোক রেশমী কাপড়ের পোশাক পরে ঈদগাহে যায়। তাদের বুঝা উচিত যে, তাদের নামায কবূল

হয় না। রেশমী কাপড়ের পোশাক নিজেরাও পরবেন না, নিজেদের ছেলে সন্তানদেরও পরাবেন না।

বন্ধুগণ! কেউ কি কোন বাদশাহর দরবারে যাওয়ার সময় নিজেকে বাদশাহর বিদ্রোহীদের পোশাকে সজ্জিত করে যাবে এবং বিদ্রোহীদের আকৃতি ধারণ করে যাবে? কিছুতেই নয়। তাহলে খুদার বড়ত্ব কি দুনিয়ার বাদশাহদের সমানও নয়? এটা ভেবে দেখুন। আল্লাহ তাআলার আযাবকে চোখের সামনে রাখুন এবং এইসব অনর্থক ও কৃত্রিম বস্তুকে ছেড়ে দিন। আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করুন, যেন তিনি আমাদের তাওফীক দান করেন। আমীন, সুম্মা আমীন!

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

* রোযা আমাদের কাছে কী দাবী করে?

* কুরআন নাযিল হওয়ার মাস

* দুআ কবুলের মাস

রোযা আমাদের কাছে কী দাবী করে?

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نومن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئت اعمالنا من يهد ه الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادى له و نشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له و نشهدان سيدنا و مولنا محمدا عبده و رسوله صلى الله تعالى عليه و على اله واصحابه و بارك و سلم تسليما كثيرا

اما بعد :

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ -

امنت بالله صدق الله مولانا العظيم - و صدق رسوله النبى الكريم و نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العلمين -

বরকতপূর্ণ মাস

ইনশাআল্লাহ কয়েক দিন পরেই রমযানুল মুবারক মাস শুরু হতে যাচ্ছে। কোন্ মুসলমান এমন আছে, যে এই মাসের মহত্ব ও বরকত সম্পর্কে অবগত নয়? আল্লাহ তাআলা এই মাসকে বানিয়েছেন তার ইবাদত করার জন্য। জানা নেই কী কী রহমত আল্লাহ তাআলা এই মাসে

তাঁর বান্দাদের প্রতি করে থাকেন। আমরা এবং আপনারা সেই সব রহমতের কথা কল্পনাও করতে পারি না।

এই মাসে কিছু কিছু আমল এমন রয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে মুসলমানমাত্রই জানেন এবং সে অনুযায়ী আমলও করে থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ এই মাসে রোযা রাখা ফরয। আলহামদুলিল্লাহ রোযা রাখার তাওফীক মুসলমানদের হয়ে যায়। তারাবীহ সম্পর্কেও জানা আছে যে, ইহা সুন্নত এবং এতে মুসলমানগণ অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করে থাকেন। কিন্তু এখন অন্য একটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই।

সাধারণভাবে মনে করা হয়ে থাকে যে, রমযানুল মুবারকের বৈশিষ্ট্য শুধু এটাই যে, তাতে রোযা রাখা হয় এবং রাতে তারাবীহ পড়া হয়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই উভয় ইবাদতই এই মাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ব্যাপার শুধু এতটুকুতেই সমাপ্ত হয় না। বরং প্রকৃতপক্ষে রমযানুল মুবারক আমাদের থেকে এর চেয়ে অধিক কিছু দাবী করে। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন—

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ -

অর্থাৎ, আমি জিন ও মানুষকে শুধু একটি কাজের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং সেটা হলো এই যে, তারা যেন আমার ইবাদত করে। এই আয়াতে করীমার মাঝে আল্লাহ তাআলা মানব সৃষ্টির বুনিয়াদী উদ্দেশ্য এটাই বলেছেন, যেন তারা আল্লাহর ইবাদত করে।

ফেরেশতাগণ কি যথেষ্ট ছিলেন না

এক্ষেত্রে কারো কারো বিশেষত নতুন আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মাঝে এই সংশয় জাগে যে, যদি মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য শুধু ইবাদতই হয়ে থাকে তাহলে এই কাজের জন্য মানুষকে সৃষ্টির কী প্রয়োজন ছিলো? এই কাজ তো ফেরেশতাগণই পূর্ব থেকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে আঞ্জাম দিয়ে আসছিলেন? তারা তো আল্লাহ তাআলার ইবাদত এবং তাঁর প্রশংসা ও

পবিত্রতা বর্ণনায় নিমগ্ন ছিলেন। এ কারণেই যখন আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেন এবং ফেরেশতাগণকে বললেন ঃ আমি এ ধরনের একজন মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি, তখন ফেরেশতাগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই কথা বললেন যে, আপনি এমন মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন, যারা দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং হত্যাকাণ্ড ঘটাবে আর ইবাদত ও তাসবীহ–তাকদীসের কাজ তো আমরা করেই চলেছি। একইভাবে আজও প্রশ্ন উত্থাপনকারীরা এই প্রশ্ন উত্থাপন করছে যে, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য যদি শুধু ইবাদতই হতো তাহলে তার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করার কোন প্রয়োজন ছিলো না ; এই কাজ তো ফেরেশতাগণই পূর্ব থেকে আঞ্জাম দিয়ে আসছেন?

ফেরেশতাগণের কোন কামাল বা অর্জিত যোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব নেই

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলার ফেরেশতাগণ আল্লাহ তাআলার ইবাদত করে থাকেন। কিন্তু তাদের ইবাদত সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির এবং মানুষকে যে ইবাদতের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে,তাও সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। এজন্য যে, ফেরেশতাগণ যে ইবাদত করেন, তাদের স্বভাব ও রুচিতে তার বিপরীত করার অবকাশই নেই। তারা কিভাবে চাইবেন যে, ইবাদত করবেন না, তাদের মাঝে তো ইবাদত ত্যাগ করার কোন যোগ্যতাই নেই। আল্লাহ তাআলা তাদের থেকে গুনাহ করার সম্ভাবনাই তিরোহিত করে দিয়েছেন। তাদের ক্ষুধা লাগে না, পিপাসা লাগে না এবং তাদের মাঝে প্রবৃত্তিগত তাড়না জাগ্রত হয় না। এমনকি তাদের অন্তরে গুনাহর প্ররোচনাও আসে না ; গুনাহ করার আগ্রহ এবং গুনাহর দিকে অগ্রসর হওয়া তো দূরের কথা। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা তাদের ইবাদতের বিনিময়ে কোন প্রতিদান ও সওয়াবও নির্ধারণ করেননি। কারণ, ফেরেশতাগণ যে গুনাহ না করে থাকছেন, এতে তাদের কোন কামাল বা অর্জিত শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তাই তাদের যখন কোন অর্জিত শ্রেষ্ঠত্ব নেই তখন জান্নাতওয়ালা প্রতিদান ও সওয়াবও যুক্ত হবে না।

অন্ধের দৃষ্টি সংযমে কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই

উদাহরণ স্বরূপ এক ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তি থেকে বঞ্চিত। যার কারণে সারাজীবন সে না কখনো ফিল্ম দেখেছে, না কখনো টিভি দেখেছে, না দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে কখনো কোন গায়রে মুহাররমের প্রতি। বলুন! এই গুনাহগুলো না করার ক্ষেত্রে তার কী শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পেলো? কী কামাল জাহির হলো? এটা এজন্য যে, তার মাঝে এই গুনাহগুলো করার কোন যোগ্যতাই তো নেই। কিন্তু অন্য এক ব্যক্তি যার দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ সুস্থ আছে, যা চায় দেখতে পারে। কিন্তু দেখার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও যখন কোন গায়রে মুহাররমের দিকে দেখার চাহিদা অন্তরে জন্ম নেয় তখন সে তৎক্ষণাৎ শুধু আল্লাহ তাআলার ভয়ে দৃষ্টি নীচে নামিয়ে ফেলে। এখানে দৃশ্যত দু'জনই গুনাহ থেকে বেঁচে থাকছে। কিন্তু দু'জনের মাঝে আকাশ–যমীনের পার্থক্য। প্রথম ব্যক্তিও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকছে, দ্বিতীয় ব্যক্তি ও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকছে। কিন্তু প্রথম ব্যক্তির গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাটা কোন অর্জিত শ্রেষ্ঠত্ব বা কামাল নয়। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তির গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাটা শ্রেষ্ঠত্ব বা কামাল।

এই ইবাদত ফেরেশতাগণের ক্ষমতাভুক্ত নয়

সুতরাং ফেরেশতাগণ যদি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খানা না খেয়ে থাকেন তাহলে সেটা কোন কামাল নয়। কেননা তাদের ক্ষুধাই লাগে না এবং তাদের খানা খাওয়ার কোন প্রয়োজনও নেই। তাই তাদের না খাওয়ার বিনিময়ে কোন প্রতিদান ও সাওয়াবও নেই। কিন্তু মানুষ এইসব প্রয়োজন সঙ্গে নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। তাই কোন মানুষ, যত উঁচু থেকে উঁচু স্তরেই পৌঁছে যাক, এমনকি সর্বোচ্চ স্তর অর্থাৎ নবুওয়তের স্তরেও পৌঁছে যাক তখনও সে খানাপিনা থেকে অমুখাপেক্ষী বা বেপরোয়া হতে পারে না। এ কারণেই কাফেররা নবীগণের প্রতি এই আপত্তি উঠায় যে,

مَالِهٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْ كُلُ الطَّعَامَ وَ يَمْشِىْ فِى الْاَسْوَاقِ

অর্থাৎ, 'এ কেমন রাসূল যে, সে খানাও খায়, বাজারেও চলাফেরা করে।'

সুতরাং খাওয়া–দাওয়া করার চাহিদা নবীগণের সাথেও সংযুক্ত। অতএব যদি মানুষের ক্ষুধা লাগতে থাকে আর আল্লাহর হুকুমের কারণে সে খানা না খায় তাহলে তা হবে কামালের কথা, অর্জিত যোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা। এজন্যই আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাগণকে এরশাদ করেছেন, আমি এমন এক সৃষ্টিজীব সৃষ্টি করছি, যাদের ক্ষুধাও লাগবে, পিপাসাও লাগবে এবং যাদের মাঝে প্রবৃত্তির তাড়না ও গুনাহ করার চাহিদাও জন্ম নিবে। কিন্তু গুনাহ করার চাহিদা যখন জন্ম নিবে তখন তারা আমাকে স্মরণ করবে এবং আমাকে স্মরণ করে নিজেদেরকে সেই গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। মানুষের এই ইবাদত এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা আমার কাছে মর্যাদা ও মূল্য লাভ করে। তার প্রতিদান, সওয়াব এবং বিনিময় দেওয়ার জন্য আমি এমন জান্নাত তৈরী করে রেখেছি, যার বৈশিষ্ট্য হবে— عَرْضُهَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ [তার প্রশস্ততা হবে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল পর্যন্ত] । এটা এজন্য যে, তার অন্তরে তাড়না ও চাহিদা জন্ম নিচ্ছে, প্রবৃত্তি জেগে উঠছে এবং গুনাহর প্রতি প্ররোচনাদানকারী উপাদান সামনে আসছে, কিন্তু এই মানুষ আমার ভয়ে এবং আমার বড়ত্বের চিন্তায় নিজের চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখছে, নিজের কানকে গুনাহ থেকে সংযত রাখছে, নিজের মুখকে গুনাহ থেকে মুক্ত রাখছে এবং গুনাহর দিকে ধাবমান পাগুলোকে থামিয়ে দিচ্ছে। সে এই কাজগুলো এই চিন্তা করে করছে যে, আমার আল্লাহ যেন আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হয়ে যান। এই ইবাদত ফেরেশতাগণের ক্ষমতাভুক্ত ছিলো না। এই ইবাদতের জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

হযরত ইউসুফ (আঃ)এর কামাল বা শ্রেষ্ঠত্ব

যুলেখার মোকাবেলায় যেই ফেৎনা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সামনে হাযির হয়েছিলো, কোন্ মুসলমান এমন আছে যে, তা জানে না? কুরআনে করীম বলছে যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে যুলেখা গুনাহর দিকে আহবান জানালো। সে মুহূর্তে যুলেখার অন্তরেও গুনাহর ভাবনা জেগে উঠেছে এবং হযরত ইউসুফ আলাইহিস

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

সালামের অন্তরেও গুনাহর ভাবনা চলে এসেছে। সাধারণ মানুষ এ কারণে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের প্রতি আপত্তি উঠায় এবং তাঁর দুর্বলতার কথা বলে। অথচ কুরআন করীম এ কথা বলতে চায় যে, গুনাহর ইচ্ছা ও ভাবনা চলে আসা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার ভয় এবং তাঁর বড়ত্বের প্রতি স্বতঃপ্রণোদিত অনুভূতির কারণে তিনি এই গুনাহর ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দেননি এবং আল্লাহ তাআলার হুকুমের সামনে মাথা নত করে দিয়েছেন। কিন্তু যদি গুনাহর চিন্তাও অন্তরে না আসতো, গুনাহ করার যোগ্যতাই না থাকতো এবং গুনাহ করার চাহিদাই সৃষ্টি না হতো, তাহলে যদি হাজার বারও যুলেখা গুনাহর দিকে আহবান করতো, তবে তাঁর কোন কামাল বা অর্জিত শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় হতো না। কামাল তো এটাই ছিলো যে, গুনাহর দিকে আহবান করা হচ্ছে, পরিবেশ ও বিদ্যমান, পরিস্থিতিও প্রস্তুত এবং অন্তরে ভাবনাও আসছে। কিন্তু এতসব কিছু সত্ত্বেও আল্লাহর হুকুমের সামনে তিনি মাথানত করে দিয়ে বলেছেন ঃ معاذ الله অর্থাৎ আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। এটাই হচ্ছে সেই ইবাদত, যার জন্য আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা ইউসূফ—২৪)

আমাদের জান-প্রাণ বিক্রি হয়ে গেছে

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই যখন ইবাদত, তখন তার চাহিদা ছিলো এই যে, মানুষ যখন দুনিয়াতে আসে তখন সকাল থেকে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত ইবাদত ব্যতীত তার আর কোন কাজ না করা চাই এবং তার অন্য কাজ করার অনুমতি না থাকা চাই। তাই অন্যস্থানে কুরআন মজীদ এরশাদ করেছে—

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ -

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা মু'মিনদের থেকে তাদের জান এবং মাল কিনে নিয়েছেন এবং তার বিনিময় এটা নির্ধারন করেছেন যে, আখেরাতে তারা জান্নাত লাভ করবে। সুতরাং আমাদের জান-প্রাণই যেহেতু বিক্রি হয়ে গেছে, সেহেতু এই জান ও প্রাণ, যা নিয়ে আমরা

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

বসে আছি, তা আসলে আমাদের নয় ; বরং বিক্রি হয়ে যাওয়া সম্পদ। তার মূল্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। যখন এই জান–প্রাণ নিজেদের থাকলো না, তখন তার চাহিদা ও দাবী এই ছিলো যে, এই প্রাণ ও দেহকে আল্লাহর ইবাদত ব্যতীত অন্য কোন কাজে না লাগানো হোক। তাই আমাদেরকে যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে এই হুকুম দেওয়া হয় যে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমাদের অন্য কাজ করার অনুমতি নেই, শুধু সিজদায় পড়ে থাকো এবং আল্লাহ আল্লাহ করো, অন্য কোন কাজেরই অনুমতি নেই ; না উপার্জনের অনুমতি, না খাওয়া–দাওয়ার অনুমতি, তাহলে এই হুকুম ইনসানের বিরুদ্ধে হতো না। এজন্য যে, আমাদেরকে তো সৃষ্টিই করা হয়েছে ইবাদতের জন্য।

এমন ক্রেতার জন্য উৎসর্গীত হয়ে যান

কিন্তু কুরবান হয়ে যান, উৎসর্গীত হয়ে যান এমন ক্রেতার প্রতি ; কারণ আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রাণ ও সম্পদকে কিনেও নিয়েছেন এবং তার মূল্যও পুরোপুরি ঠিক করে দিয়েছেন অর্থাৎ জান্নাত। অতঃপর সেই প্রাণ ও সম্পদ আমাদেরকে এ কথা বলে ফিরিয়েও দিয়েছেন যে, তোমরা এই প্রাণ সম্পদ তোমাদের কাছে রেখে দাও। এবং আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই বিষয়ের অনুমতি দিয়ে রেখেছেন যে, তোমরা খাও, পান করো এবং দুনিয়ার কারবার করো। তারপর পাঁচওয়াক্ত নামায পড়ো এবং অমুক অমুক জিনিস থেকে সংযত থাকো। বাকী যেভাবে চাও, করো। এটা আল্লাহ তাআলার বিরাট রহমত এবং দান।

এই মাসে আসল উদ্দেশ্যের দিকে ফিরে এসো

কিন্তু বৈধ করে দেওয়ার ফলাফল কী হয় ; আল্লাহ তাআলারও জানতেন যে, যখন এই মানুষ দুনিয়ার কারবার এবং কাজকর্ম ও ধান্ধায় লেগে যাবে তখন ধীরে ধীরে তার অন্তরে উদাসীনতার পর্দা পড়ে যাবে এবং কারবার আর ধান্ধায় সে হারিয়ে যাবে। সেজন্যই এই উদাসীনতা দূর

করার জন্য পর্যায়ক্রমে কিছু কিছু সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সেই সময়গুলির একটি হলো রমযানুল মুবারক মাস। কারণ, বছরের এগার মাসতো আপনি ব্যবসায়, কৃষি কাজে, মজদুরিতে, দুনিয়ার কারবার ও ধান্ধায় এবং খাওয়া–দাওয়া, উপার্জন, হাস্য রসিকতা আর গল্পে লিপ্ত হয়ে থাকেন ; আর এর ফলে অন্তরসমূহে উদাসীনতার আবরণ পড়ে যেতে থাকে। তাই একটি মাসকে আল্লাহ তাআলা এই কাজের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, এই মাসে তোমরা নিজেদের আসল সৃষ্টির উদ্দেশ্য অর্থাৎ ইবাদতের দিকে ফিরে এসো ; যে উদ্দেশ্যের জন্য তোমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে এবং যেজন্য তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই মাসে আল্লাহর ইবাদতে লেগে যাও, এগারমাস পর্যন্ত তোমাদের থেকে যেসব গুনাহ প্রকাশ পেয়েছে সেগুলোকে ক্ষমা করিয়ে নাও, অন্তরের যোগ্যতা ও পূর্ণতাসমূহের উপর যে ধূলিবালি এসে জমেছে, সেগুলোকে ধৌত করাও এবং অন্তরে উদাসীনতার যে, চাদর পড়ে গেছে, সেটাকে উঠাও। এই কাজের জন্যই আমি এই মাসকে নির্ধারণ করেছি।

রমযানের অর্থ

(رمضان) রমযান শব্দটি মীমকে সাকিন দিয়ে আমরা শব্দটির ভুল প্রয়োগ করি। সঠিক শব্দ হলো (رمضان) মীম যবরের সাথে। লোকজন রমযানের বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মূল আরবী ভাষায় 'রমযান' শব্দের অর্থ, ভস্মীভূতকারী এবং প্রজ্জ্বলনকারী। এই মাসের এই নাম এই জন্য রাখা হয়েছে যে, সর্বপ্রথম যখন এই মাসের নাম রাখা হচ্ছিলো, সেই বছরে এই মাস এসেছিলো মারাত্মক ঝলসে দেওয়া গরমের মাঝে। এইজন্য লোকেরা এই মাসের নাম রেখে দিয়েছে—রমযান।

নিজের গুনাহসমূহ ক্ষমা করিয়ে নিন

কিন্তু আলেমগণ বলেছেন, এই মাসকে রমযান এই জন্য বলা হয় যে, এই মাসে আল্লাহ তাআলা আপন রহমতে, আপন দয়া ও অনুগ্রহের বদৌলতে বান্দাদের গুনাহসমূহ ভস্মিভূত করে দেন এবং জ্বালিয়ে দেন।

এই উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তাআলা এই মাসকে নির্ধারিত করেছেন। তাই এগার মাসে দুনিয়াবী কায়–কারবার, দুনিয়াবী ধান্ধাসমূহের মাঝে লিপ্ত থাকার ফলে যেসব উদাসীনতা অন্তরকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে এবং এই সময়কালে যেসকল ভুল–ত্রুটি ও গুনাহের প্রকাশ ঘটেছে, আল্লাহ তাআলার সামনে হাযির হয়ে সেগুলোকে ক্ষমা করিয়ে নিন এবং উদাসীনতার চাদরসমূহকে অন্তর থেকে উঠিয়ে দিন, যেন জীবনের এক নতুন পর্ব শুরু হয়ে যায়। এজন্যই কুরআনে করীম এরশাদ করেছে—

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -

অর্থাৎ এই রোযা তোমাদের উপর এইজন্য ফরয করা হয়েছে, যেন তোমাদের মাঝে তাকওয়া সৃষ্টি হয়ে যায়। সুতরাং রমযান মাসের আসল উদ্দেশ্য হলো, সারা বছরের গুনাহসমূহ ক্ষমা করানো, উদাসীনতার আবরণকে অন্তর থেকে উঠানো এবং অন্তরসমূহে তাকওয়া সৃষ্টি করা। যেমন কোন মেশিনকে যদি কিছুকাল ব্যবহার করা হয় তবে তারপর তার সার্ভিসিং করাতে হয়,তাকে পরিষ্কার করাতে হয়, তেমনি আল্লাহ তাআলা মানুষের সার্ভিসিং এবং ওয়ারলিং–এর জন্যই এই রমযানুল মুবারক মাস নির্ধারণ করেছেন। যেন এই মাসে মুসলমানগণ নিজেদেরকে পরিচ্ছন্ন করিয়ে নেয় এবং নিজেদের জীবনের এক নতুন আকৃতি ও রূপদান করে।

এই মাসকে মুক্ত করে নিন

অতএব শুধু রোযা রাখা এবং তারাবীহ পড়ার সীমানা পর্যন্তই বিষয়টা ক্ষান্ত হয়ে যায় না, বরং এই মাসের চাহিদা হলো, মানুষ যেন এই মাসে নিজেকে অন্য সকল কাজ কর্ম থেকে মুক্ত করে নেয়, ফারেগ করে নেয়। এজন্য যে, এগার মাস পর্যন্ত সে জীবনের অন্যান্য কাজ ও ধান্ধায় ব্যস্ত থেকেছে। কিন্তু এই মাস মানুষের জন্য তার সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্যের দিকে প্রত্যাবর্তনের মাস। তাই এই মাসের সকল সময়, অন্যথায় অবশ্যই অধিকাংশ সময় অথবা যতটুকু অধিক থেকে অধিকতর

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

সময় সম্ভব হয় আল্লাহ তাআলার ইবাদতের মাঝে ব্যয় করা চাই। এবং এ লক্ষ্যে আগে থেকেই মানুষের প্রস্তুত হওয়া উচিত আর পূর্ব থেকেই প্রোগ্রাম তৈরী করা উচিত।

রমযানকে স্বাগত জানানোর সঠিক পন্থা

বর্তমানে ইসলামী দুনিয়ায় একটি বিষয় চালু হয়ে গেছে ; যার সূচনা হয়েছে আরব রাষ্ট্রগুলো থেকে, বিশেষত মিসর এবং সিরিয়া থেকে। পরবর্তীতে অন্যান্য দেশেও প্রচলিত হয়ে গেছে এবং আমাদের এখানেও চলে এসেছে। বিষয়টি হলো এই যে, রমযান শুরু হওয়ার আগে কিছু কিছু মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় ; যেসব মাহফিলের নাম রাখা হয়— রমযানকে স্বাগত জানানোর মাহফিল। রমযানের দু'–একদিন পূর্বে একটি সমাবেশ করা হয় এবং সেই সমাবেশে কুরআনে করীমের তেলাওয়াত আর ওয়ায ও বক্তৃতা পেশ করা হয়। এ সবের উদ্দেশ্য থাকে, লোকজনকে এই কথা জানানো যে, আমরা রমযানুল মুবারককে স্বাগত জানাচ্ছি এবং তাকে খোশ আমদেদ বলছি।

রমযানুল মুবারককে স্বাগত জানানোর এই আবেগ খুব ভালো। কিন্তু এই ভালো আবেগই যখন কিছু সামনে অগ্রসর হয়ে যায় তখন কিছুকাল পরে তা বিদআতের রূপ ধারণ করে বসে। সে কারণেই কোন কোন জায়গায় স্বাগত জানানোর এই মাহফিল বিদআতের রূপ ধারণ করে ফেলেছে। অথচ রমযানুল মুবারকের প্রকৃত স্বাগত জ্ঞাপন হলো, রমযান আসার আগে নিজের সময়সূচী পরিবর্তন করে এমন বানানোর চেষ্টা করা, যেন অধিক থেকে অধিকতর সময় তাতে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর ইবাদতে ব্যয় হয়। রমযান মাস আসার পূর্বে এই কথা ভাবুন যে, এই মাসটি আসছে। কিভাবে আমি আমার ব্যস্ততা কমাতে পারি। কোন ব্যক্তি যদি এই মাসে নিজেকে ইবাদতের জন্য সম্পূর্ণ মুক্ত করে নেয়, তাহলে সুবহানাল্লাহ, খুবই ভালো হয়। আর যদি কেউ নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে না পারেন তাহলে এটা চিন্তা করে দেখুন যে, কোন্ কোন্ কাজ এক মাসের জন্য ছাড়তে পারছি ; সেগুলোকে ছেড়ে দিন। ভেবে দেখুন কোন্ ব্যস্ততাগুলো কমিয়ে দিতে পারবো, সেগুলোকে কমিয়ে দিন এবং

যেই কাজগুলোকে রমযান পরবর্তী পর্যন্ত বিলম্বিত করতে পারবেন সেগুলোকে বিলম্বিত করে দিন। রমযানের অধিক থেকে অধিকতর সময়কে ইবাদতের মাঝে ব্যয় করার কথা ভাবুন। আমার কাছে রমযানকে স্বাগত জানানোর সঠিক পন্থা এটাই। যদি এমনটি করেন তাহলে ইনশাআল্লাহ রমযানুল মুবারকের সঠিক রূহ এবং তার নূর ও বরকতসমূহ হাসিল হয়ে যাবে। অন্যথায় এই হবে যে, রমযানুল মুবারক আসবে এবং চলে যাবে, কিন্তু সঠিকভাবে তার দ্বারা আমরা উপকার লাভ করতে পারবো না।

রোযা ও তারাবীহ্ থেকে এক কদম সামনে

রমযানুল মুবারককে যখন অপরাপর ব্যস্ততা থেকে মুক্তই করলেন তখন সেই মুক্ত সময়কে এবার কোন্ কাজে ব্যয় করবেন? রোযা প্রসঙ্গে সকলেই জানেন যে, রোযা রাখা ফরয। তারাবীহ্ সম্পর্কেও সকলে অবগত। কিন্তু একটি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি।

সেটি হলো এই যে, আলহামদুলিল্লাহ, যে ব্যক্তির অন্তরে অণু পরিমাণও ঈমান রয়েছে, তার অন্তরে রমযানুল মুবারকের একটি সম্মান ও মর্যাদা অবস্থান করে ; যার কারণে তার এই চেষ্টা থাকে যে, এই মুবারক মাসে সে আল্লাহর ইবাদত কিছু বেশী করে এবং কিছু নফল বেশী পড়ে। যে সকল লোক সাধারণ দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের জন্য মসজিদে আসার ব্যাপারে কাতর হয়ে যায়, সে সকল লোকেরাও তারাবীহ্র মতো লম্বা নামাযে প্রতিদিন শরীক হয়ে থাকে। এই সবকিছু আলহামদুলিল্লাহ্ এই মাসের বরকত যে, মানুষ ইবাদতের মাঝে, নামাযের মাঝে, যিকির–আযকার এবং কুরআন তেলাওয়াতের মাঝে মগ্ন হয়ে থাকে।

একটি মাস এইভাবে কাটিয়ে দিন

কিন্তু এইসব নফল নামায, নফল ইবাদত, নফল যিকির–আযকার নফল কুরআন তেলাওয়াতের চেয়েও অধিক অগ্রগণ্য আরো একটি বিষয়

রয়েছে ; যে বিষয়টির দিকে মনোযোগ দেওয়া হয় না। সেটি হলো এই যে, গুনাহসমূহ থেকে এই মাসটিকে পবিত্র রেখে এমনভাবে অতিবাহিত করা চাই, যেন এই মাসে আমাদের দ্বারা কোন গুনাহ সংঘটিত না হয়। এই মুবারক মাসে চোখ যেন বিভ্রান্ত না হয়, চোখ যেন ভুল জায়গায় না পড়ে, কান যেন ভুল জিনিস না শুনে, মুখ থেকে যেন কোন ভুল শব্দ না বাহির হয় এবং আল্লাহ তাআলার নাফরমানী থেকে যেন পরিপূর্ণভাবে সংযমী ও সংযত থাকা হয়। এই মুবারক মাসটি যদি এভাবে কাটিয়ে দেওয়া যায়, তারপর চাই নফল এক রাকাতও না পড়া হোক, তেলাওয়াত অধিক না করা হোক, না করা হোক যিকির-আযকার ; কিন্তু গুনাহসমূহ থেকে বিরত থেকে, আল্লাহর অবাধ্যতা ও নাফরমানী থেকে সংযত থেকে যদি আপনি এই মাসটি কাটিয়ে দেন তাহলে আপনি মুবারকবাদের যোগ্য হবেন এবং এই মাসটি হবে আপনার জন্য যথার্থই মুবারক। এগারমাস পর্যন্ত আপনি সব ধরনের কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকেন আর আল্লাহ তাবারক ও তাআলার এই মাসটি আসছে, অন্তত এই মাসটিকে গুনাহসমূহ থেকে পবিত্র করে নিন। এই মাসে আল্লাহর নাফরমানী করবেন না, অন্ততপক্ষে মিথ্যা বলবেন না, গীবত করবেন না ; এই মাসে অন্তত কুদৃষ্টিদানে লিপ্ত হবেন না, কানসমূহকে গলদ জায়গায় ব্যবহার করবেন না, এই মাসে ঘুষ খাবেন না, সুদ খাবেন না। কমচেয়ে কম এই একটি মাস এইভাবে অতিবাহিত করুন।

এ কেমন রোযা?

এ জন্য যে, আপনারা রোযা তো মাশাআল্লাহ অত্যন্ত আগ্রহ উদ্দীপনার সাথে রেখে চলেছেন, কিন্তু রোযার অর্থ কী? রোযার অর্থ হলো, খাওয়া থেকে বিরত থাকা, পান করা থেকে বিরত থাকা এবং প্রবৃত্তির তাড়না পূরণ থেকে সংযত থাকা। রোযার মধ্যে এই তিনটি জিনিস থেকেই বিরত থাকা আবশ্যকীয়। এবার লক্ষ্য করে দেখুন যে, এই তিনটি জিনিসই এমন যে, যা মূলগত ও সত্তাগতভাবে হালাল। খাওয়া হালাল, পান করা হালাল এবং বৈধ পন্থায় স্বামী-স্ত্রীর যৌন তাড়না পূরণ করা হালাল। এখন রোযা চলাকালে আপনি হালাল জিনিসগুলো

থেকে বিরত থাকছেন, খাচ্ছেন না, পান করছেন না, কিন্তু যে বস্তুগুলো পূর্ব থেকেই হারাম ছিলো, যেমন মিথ্যা বলা, গীবত করা, কুদৃষ্টি দেওয়া সর্বাবস্থাতেই যা হারাম ছিলো ; রোযার মধ্যে এ সকল জিনিস ঘটে চলেছে। এখন রোযাও থাকা হচ্ছে, মিথ্যাও বলছে, রোযাও থাকা হচ্ছে আর গীবতও করছে, রোযাও থাকা হচ্ছে আর কুদৃষ্টিও দিচ্ছে, রোযাও থাকা হচ্ছে আর সময় কাটানোর জন্য নোংরা ও অশ্লীল নান ফিল্মও দেখছে। এ কেমন রোযা হলো যে, হালাল জিনিস তো ঠিকই ছেড়ে দিলেন, কিন্তু হারাম জিনিসকে ছাড়লেন না?

এজন্যই হাদীস শরীফে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন—"যে ব্যক্তি রোযা থাকা অবস্থায় মিথ্যা বলা ত্যাগ করে না তার ক্ষুধা ও পিপাসার কোন প্রয়োজন আমার নেই।" কেননা পূর্ব থেকেই হারাম হয়ে থাকা মিথ্যা কথা বলাকে না ছেড়ে খাওয়া-দাওয়া ত্যাগ করে এমন কী বড় আমলটা সে করলো?

রোযার সওয়াব ধূলায় মিশে গেছে

যদিও ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে রোযা সঠিক হয়ে গেছে। যদি কোন মুফতীকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আমি রোযাও রেখেছিলাম আর মিথ্যাও বলেছিলাম তাহলে সেই মুফতী এই উত্তরই দিবেন যে, রোযা সঠিক হয়ে গেছে, তার কাযা করা ওয়াজিব নয়। কিন্তু কাযা ওয়াজিব না হওয়া সত্ত্বেও সেই রোযার সওয়াব এবং যাবতীয় বরকত ধূলায় মিশে গেছে। কারণ হচ্ছে এই যে, আপনারা সেই রোযার প্রাণটাকেই অর্জন করেননি।

রোযার উদ্দেশ্য তাকওয়ার প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করা

আমি আপনাদের সামনে এই যে আয়াতখানা তেলাওয়াত করেছি

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -

['হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন

www.banglakitab.weebly.com

www.islamfind.wordpress.com

পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপর ফরয করা হয়েছিলো।' কেন ফরয করা হয়েছিলো? 'যেন তোমাদের মাঝে তাকওয়া জন্ম নেয়।' অর্থাৎ আসলে তোমাদের দায়িত্বে রোযা এজন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, যেন তার দ্বারা তোমাদের অন্তরে তাকওয়ার প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হয়। রোযার মাধ্যমে তাকওয়া কিভাবে সৃষ্টি হয়?

রোযা তাকওয়ার সিঁড়ি

কোন কোন আলেম বলেছেন, রোযার মাধ্যমে তাকওয়া এইভাবে সৃষ্টি হয় যে, রোযা মানুষের জান্তব ও পাশবিক শক্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। মানুষ যখন ক্ষুধার্ত থাকবে তখন সে কারণে তার পাশবিক প্রবৃত্তি এবং পাশবিক চাহিদা দলিত-মথিত হবে। যার ফলে গুনাহ ও পাপাচারের দিকে তার অগ্রসর হওয়ার আগ্রহ ও আবেগে ভাটা পড়বে।

কিন্তু আমাদের হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী সাহেব থানভী কাদ্দাসাল্লাহু সিররাহু—আল্লাহ তাআলা তাঁর দারাজাত বুলন্দ করুন আমীন—বলেছেন, শুধু পাশবিক শক্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার বিষয় নয়, বরং প্রকৃতপক্ষে বিষয় হচ্ছে এই যে, মানুষ যখন সহীহ তরীকায় রোযা রাখবে তখন এই রোযা স্বয়ং তাকওয়ার একটি মহিমামণ্ডিত সিঁড়িতে পরিণত হবে। কারণ হলো, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে—তাকওয়ার অর্থ কী? তাকওয়ার অর্থ হলো এই যে, অন্তরে আল্লাহ জাল্লা জালুলুহুর বড়ত্বের স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি জাগরণের মাধ্যমে গুনাহ-খাতা থেকে বেঁচে থাকা। অর্থাৎ এই কথা ভাবতে হবে যে, আমি আল্লাহর বান্দা এবং আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখছেন, আল্লাহ তাআলার সামনে হাযির হয়ে আমাকে জবাব দিতে হবে, আল্লাহ তাআলার সামনে পেশ হতে হবে। এই অনুভূতি ও ভাবনার পর যখন মানুষ গুনাহ ও পাপাচারকে ত্যাগ করে, তখন তার নাম হয় তাকওয়া। যেমন আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন—

وَ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি এই বিষয়ে ভীত হয় যে, আমাকে আল্লাহ

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

তাআলার দরবারে হাযির হতে হবে, দাঁড়াতে হবে এবং এই ভয়ের কারণে নফসের প্ররোচনা এবং প্রবৃত্তির তাড়না থেকে সে নিজেকে সংযত রাখে, তার এই চেতনা ও কর্মই তাকওয়া।

আমার মালিক আমাকে দেখছেন

সুতরাং তাকওয়া হাসিল করার জন্য রোযা সর্বোত্তম ট্রেনিং এবং সর্বোন্নত প্রশিক্ষণ। মানুষ যখন রোযা রেখেই ফেলে তখন সে যতই গুনাহগার, পাপাচারী, ফাসেক, ফাজের হোক ; সে যে ধরনের লোকই হোক, রোযা রাখার পর কিন্তু তার অবস্থা ও পরিস্থিতি এই হয়ে যায় যে, তীব্র গরমের দিন, মারাত্মক পিপাসা লেগেছে, কামরায় সে একাকী অবস্থান করছে, অন্য কেউ কাছে নেই, দরজায় সিটকিনি লাগানো আছে, কামরায় ফ্রিজ রয়েছে, সেই ফ্রিজে ঠাণ্ডা পানিও বিদ্যমান, এমন মুহূর্তে মানুষের মন এটাই আকাংখা করে যে, এই তীব্র গরমের মধ্যে ঠাণ্ডা পানি পান করে ফেলি ; কিন্তু সেই ব্যক্তি কি ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা পানি বের করে পান করে ফেলবে? কক্ষণো নয়। অথচ সে যদি পানি পান করেই ফেলতো, তবে কোন মানুষেরই কানে খবরটা পৌছতো না, কোন অভিশাপ ও গালমন্দ বর্ষণকারীও থাকতো না ; দুনিয়াবাসীর সামনে সে রোযাদা রূপেই পরিচিত থাকতো। সন্ধ্যায় সে বাহিরে বের হয়ে লোকজনের সাথে আরাম করে ইফতার করে ফেললে কোন ব্যক্তিই জানতে পারতো না যে, সে রোযা ভেঙে ফেলেছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সে পানি পান করে না। কেন পান করে না? পানি পান না করার কারণ এছাড়া অন্য কিছুই হতে পারে না যে, সে চিন্তা করে—যদিও আমাকে কেউ দেখছে না, কিন্তু আমার মালিক, যার জন্য আমি রোযা রেখেছি, তিনি আমাকে দেখছেন।

আমিই তার প্রতিদান দেবো

এ কারণেই আল্লাহ জাল্লা শানুহু এরশাদ করেন—

الصوم لی وانا اجزی به

[তিরমিযী, সওম অধ্যায়, পরিচ্ছেদ—মাজা আ ফী ফাযলিস সাওম, হাদীস নম্বর–৭৬৪]

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

অর্থাৎ, রোযা আমার জন্য। অতএব আমিই তার প্রতিদান দেবো। যাবতীয় আমল সম্পর্কে বলা হয়েছে, কোন আমলের দশগুণ সওয়াব, কোন আমলের সত্তরগুণ সওয়াব এবং কোন আমলের একশত গুণ সওয়াব দেওয়া হবে। এমনকি সদকার সওয়াব ও বিনিময় সাতশত গুণ বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু রোযা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন যে, রোযার প্রতিদান আমিই দেবো। কেননা রোযা তো সে শুধু আমার জন্যই রেখেছিলো। কারণ, তীব্র গরমের ফলে যখন গলার অভ্যন্তরে কাঁটার মত বিঁধছে, মুখ পিপাসায় শুকিয়ে গেছে, ফ্রিজে ঠাণ্ডা পানি বিদ্যমান আছে, আছে নির্জনতা ও একাকীত্ব এবং দেখার মতও কেউ নেই ; এতদসত্ত্বেও আমার বান্দা শুধু এইজন্যই পানি পান করছে না যে, তার অন্তরে আমার সামনে দাঁড়ানো এবং দাঁড়িয়ে জবাবদিহি করার ভীতি ও অনুভূতি জাগ্রত ছিলো। এই অনুভূতি ও মনোভাবেরই নাম তাকওয়া। যদি এই অনুভূতি সৃষ্টি হয়ে যায়, তবে তাকওয়াও সৃষ্টি হয়ে যাবে। সুতরাং রোযা হচ্ছে তাকওয়ার একটি আকৃতি ও অবয়ব এবং তাকওয়া হাসিলের একটি সিঁড়িও বটে। এজন্য আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন, আমি রোযা এজন্য ফরয করেছি, যেন তাকওয়ার বাস্তব প্রশিক্ষণ হয়ে যায়।

অন্যথায় এই প্রশিক্ষণ কোর্স পূর্ণাঙ্গ হবে না

আল্লাহ তাআলা যেন বলছেন—এবং যখন তোমরা রোযার মাধ্যমে এই বাস্তব প্রশিক্ষণ লাভ করে চলেছো তখন এর আরো উন্নতি দান করো, একে আরো সামনে অগ্রসর করো। তাই যেভাবে রোযা থাকা অবস্থায় তীব্র পিপাসা সত্ত্বেও পানি পান করা থেকে বিরত থেকেছিলে এবং আল্লাহর ভয়ে খানা খাওয়া থেকে সংযত থেকেছিলে, তেমনিভাবে যখন জীবনের নানা কায়-কারবারে বাহির হবে এবং সেখানে যখন আল্লাহর অবাধ্যতা ও নাফরমানীর চাহিদা ও প্ররোচনার সৃষ্টি হবে তখন সেখানেও আল্লাহর ভয়ে এই অবাধ্যতা থেকে বিরত হয়ে যাও। কেননা এক মাসের জন্য আমি তোমাদেরকে একটি প্রশিক্ষণ কোর্স করিয়ে চলেছি এবং প্রশিক্ষণ কোর্স তখনই পূর্ণাঙ্গ হবে যখন জীবনের কারবারে,

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

সকল ক্ষেত্রে, সকল সুযোগে এর ওপর আমল করবে। অন্যথায় এভাবে এই প্রশিক্ষণ কোর্স পূর্ণাঙ্গ হবে না যে, আল্লাহর ভয়ে পানি পান করা থেকে তো ঠিকই বিরত থাকলে, কিন্তু জীবনের অঙ্গনে যখন বাহির হলে তখন দৃষ্টি পড়ছে ভুল জায়গায়, কান শুনছে গলদ কথা এবং যবান থেকেও বের হচ্ছে গলদ কথা। এভাবে তো এই কোর্স পূর্ণাঙ্গ হবে না।

রোযার এয়ারকণ্ডিশন তো লাগিয়ে দিলে, কিন্তু?

চিকিৎসা যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি সংযম ও পরিহারও আবশ্যকীয়। আল্লাহ তাআলা রোযা এই জন্য রাখিয়েছেন, যেন আপনাদের মাঝে তাকওয়া সৃষ্টি হয়। কিন্তু তাকওয়া তখনই সৃষ্টি হবে যখন আল্লাহর নাফরমানী এবং অবাধ্যতাসমূহ থেকে সংযত থাকবেন। উদাহরণস্বরূপ কামরাকে ঠাণ্ডা করার জন্য আপনি তাতে এয়ারকণ্ডিশন লাগিয়ে দিলেন। এয়ারকণ্ডিশনের দাবী ও স্বভাব হলো, সে গোটা কামরাকেই ঠাণ্ডা করে দেয়। এখন আপনি এয়ারকণ্ডিশন তো অন্ করলেন কিন্তু সাথে সাথে সেই কামরার জানালা-দরজাগুলো খুলে দিলেন। এদিক থেকে শীতলতা আসছে। অপরদিক দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। তাই সেই কামরা ঠাণ্ডা হচ্ছে না। ঠিক এভাবেই চিন্তা করুন যে, রোযার এয়ারকণ্ডিশন তো আপনি লাগিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু সাথে সাথেই অপরদিকে আল্লাহর নাফরমানী এবং অবাধ্যতার দরজা-জানালাগুলো খুলে দিয়েছেন। এবার বলুন! এমন রোযার দ্বারা কি কোন উপকার লাভ হতে পারে?

মূল লক্ষ্য হুকুমের আনুগত্য

এমনিভাবে রোযার মাঝের এই হেকমত যে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে পাশবিক শক্তিকে চূর্ণ করে দেওয়া, এটি পরবর্তী হেকমত। মূল লক্ষ্য এটা যে, আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করা হোক। গোটা দ্বীনের ভিত্তি হলো আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের হুকুমের আনুগত্য। যখন তাঁরা বলেন--খাও, তখন খাওয়াই হচ্ছে দ্বীন। অপরদিকে যখন বলেন—খেয়ো না, তখন না খাওয়াই হচ্ছে দ্বীন। আল্লাহ তাআলা

www.banglakitab.weebly.com

www.islamfind.wordpress.com

নিজের আনুগত্য এবং মান্যতার বিরল নিয়ম বানিয়েছেন যে, সারা দিন তো রোযা রাখার হুকুম দিয়েছেন এবং তার জন্য প্রতিদান ও সওয়াব নির্ধারণ করেছেন, কিন্তু ওদিকে সূর্য ডুবে যেতেই এদিকে এই হুকুম এসে গেলো যে, এখন জলদি ইফতার করো। জলদি ইফতার করাকে মুস্তাহাব ঘোষণা করা হয়েছে এবং অকারণে ইফতারে বিলম্ব করা মাকরূহ ও অপছন্দনীয় সাব্যস্ত হয়েছে। অপছন্দনীয় কেন? এজন্য যে, যখন সূর্য ডুবে গেছে তখন আমার এই হুকুম এসে গেছে যে, এখনও যদি না খাও এবং অভুক্ত থাক, তবে এই অভুক্ত অবস্থাটা আমার পছন্দনীয় নয়। তাই আমাদের মূল কাজ হলো আনুগত্য করা, নিজেদের সখ পুরা করা নয়।

আমার হুকুম লংঘন করেছে

সাধারণ অবস্থায় দুনিয়ার কোন জিনিসের প্রতি লোভ ও তা অর্জনের আগ্রহ মারাত্মক খারাপ বিষয়। যখন আল্লাহ বলবেন যে, লোভ করো তখন লোভের মাঝেই সুখ ও স্বাদ। কোন এক কবি সুন্দর বলেছেন—

چوں طمع خواهد زمن سلطان دیں - خاك به فرق قناعت بعد ازیں

অর্থাৎ 'দ্বীনের সুলতান যখন এটাই চাচ্ছেন যে, আমি লোভ ও লালসা করি তখন অল্পে তুষ্টির মাথায় মাটি। এরপর অল্পে তুষ্টিতে আর স্বাদ নেই। এরপর তো লোভ-লালসাতেই মজা।' ইফতারের মধ্যে জলদি করার এই হুকুম এ কারণেই। সূর্য ডোবার আগে তো হুকুম ছিলো এটা যে, একটি কণাও যদি মুখে চলে যায় তবে গুনাহও অনিবার্য, কাফফারাও অনিবার্য। উদাহরণস্বরূপ সাতটায় সূর্য ডোবার কথা। এখন যদি কোন ব্যক্তি ছয়টা বেজে ঊনষাট মিনিটের সময় একটি বুটের দানা খেয়ে ফেলে তখন বলুন—তার রোযা থেকে কতটুকু হ্রাস ঘটলো? শুধু একটি মিনিট সময়ের হ্রাস ঘটলো। এক মিনিটের রোযা সে ভেঙেছে। কিন্তু এই এক মিনিটের রোযার কাফফারা স্বরূপ ষাটদিন রোযা রাখা তার ওপর ওয়াজিব। কেননা ব্যাপারটি শুধু একটি বুটের দানা এবং একটি মিনিট সময়ের নয়। আসল ব্যাপার হলো এই যে, সে আমার হুকুম লংঘন করেছে। আমার হুকুম ছিলো এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য ডুবে না

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত খাওয়া জায়েয নেই। কিন্তু তুমি এই হুকুম ভেঙে দিয়েছ। সুতরাং এখন এক মিনিটের পরিবর্তে ষাট দিনের রোযা রাখো।

ইফতারে জলদি করো

এরপর যখনই সূর্য ডুবে গেলো, তখনই এই হুকুম এসে গেলো যে, এখন জলদি খাও। যদি অকারণে, অপ্রয়োজনে বিলম্ব করো তবে গুনাহ হবে। কেন? এজন্য যে, আমি হুকুম দিয়েছিলাম—খাও। এখন খাওয়াই আবশ্যকীয় কাজ।

সাহরীতে বিলম্ব করা উত্তম

সাহরী সম্পর্কে বিধান হলো এই যে, সাহরী বিলম্বে খাওয়া উত্তম। জলদি বা আগে–ভাগেই খেয়ে ফেলা সুন্নত পরিপন্থী। কোন কোন ব্যক্তি রাত বারটায় সাহরী খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। এটা সুন্নত পরিপন্থী। কেননা সাহাবায়ে কেরামেরও এটাই কর্মনীতি ছিলো যে, তাঁরা একদম শেষ সময় পর্যন্ত সাহরী খেতেন। কারণ এটা সেই সময়, যে সময়ে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে শুধু খাওয়ার অনুমোদন আছে এমন নয়, বরং তখন খাওয়ার হুকুম রয়েছে। এজন্যই যতক্ষণ পর্যন্ত সেই সময়টা বাকী থাকবে আমরা খেতে থাকবো। কেননা আল্লাহ্ তাআলার হুকুমের অনুসরণ ও আনুগত্য এরই মাঝে। কোন ব্যক্তি যদি পূর্বেই সাহরী খেয়ে নেয় তাহলে সে যেন রোযার সময় ও মেয়াদে নিজের পক্ষ থেকেই সংযোজন ঘটালো। এজন্যই পূর্ব থেকে সাহরী খেয়ে রাখার বিষয়টি সম্পর্কে বারণ করে দেওয়া হয়েছে। সমগ্র দ্বীনের মাঝে গোটা খেলাটাই হচ্ছে আনুগত্যের। যখন শরীয়ত বলবে, খাও! তখন খাওয়াটাই সওয়াব আর যখন বলবে, খেয়ো না! তখন না খাওয়াটাই সওয়াব। এ কারণে হযরত হাকীমুল উম্মত কাদ্দসাল্লাহু সিররাহু বলতেন, যখন আল্লাহ তাআলা বলেন—খাও আর বান্দা বলে যে, আমি খাচ্ছি না কিংবা কম খাচ্ছি, তখন তা আর বন্দেগী এবং আনুগত্য থাকলো না। আরে ভাই! খাওয়ার মধ্যেও কিছু রাখা হয়নি, না খাওয়ার মধ্যেও কিছু রাখা হয়নি। সবকিছু রয়েছে, তাঁর আনুগত্যের মধ্যে। তাই যখন তিনি

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

বলেছেন—খাও ! তখন খেয়ে ফেলো। সে মুহূর্তে নিজের পক্ষ থেকে অধিক পাবন্দী করার প্রয়োজন নাই।

একটি মাস গুনাহ ব্যতীত অতিবাহিত করে নিন

অবশ্য গুরুত্ব দেওয়ার বিষয় হচ্ছে এটি যে, যখন রোযা রেখে ফেলেছ, তখন নিজেকে গুনাহ ও পাপাচার থেকে বাঁচাও ; চোখ বাঁচাও, কান বাঁচাও, যবান বাঁচাও। এক রমযানের সময় আমাদের হযরত কাদ্দাসাল্লাহু সিররাহু এ পর্যন্ত বলেছেন যে, আমি এমন একটি কথা বলছি, যা অন্য কেউ বলবেন না। সেটি হলো এই যে, নিজের নফসকে এমনভাবে প্রবোধ দাও এবং তার সাথে অঙ্গীকার করে নাও যে, একটি মাস গুনাহ ছাড়া কাটিয়ে দাও। যখন এই একটি মাস চলে যাবে তখন আবার তোমার যা ইচ্ছা হয় করো। এমনিভাবে হযরতওয়ালা বলেন যে, আল্লাহ তাআলার রহমতের প্রতি আশা করা যায় যে, যখন এই একটি মাস গুনাহ ব্যতীত অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন আল্লাহ তাআলা নিজেই তার অন্তরে গুনাহ ছেড়ে দেওয়ার আগ্রহ জাগিয়ে দিবেন। কিন্তু এই অঙ্গীকার করে ফেলুন যে, আল্লাহর এই যে মাসটি আসছে, এটি ইবাদতের মাস, এটি তাকওয়া সৃষ্টির মাস, আমরা তাতে গুনাহ করবো না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আস্তিনের ভিতর মুখ নিয়ে দেখুন—তিনি কোন্ গুনাহে লিপ্ত আছেন। তারপর এই গুনাহগুলোর ব্যাপারেই এই অঙ্গীকার করে ফেলুন যে, আমি এগুলোতে লিপ্ত হবো না। উদাহরণস্বরূপ এই অঙ্গীকার করে ফেলুন যে, রমযানুল মুবারকে চোখ ভুল জায়গায় উঠবে না, কান ভুল কথা শুনবে না, মুখ থেকে ভুল কথা বাহির হবে না। এটা তো কোন কিছুই হলো না যে, রোযাও রাখলেন আবার অশ্লীলতাকেও চোখে দেখছেন এবং তার দ্বারা মজাও আস্বাদন করছেন।

এই মাসে হালাল রিযিক

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটি আমাদের হযরত (রহঃ) বলতেন, সেটি হলো, অন্তত এই একটি মাসে হালাল রিযিকের প্রতি যত্নবান হও, হালাল রিযিকের ইহতিমাম করে নাও। খাবারের যেই লুকমাটি মুখে

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

আসে, যেন তা হালাল হয় ; এমন যেন না হয় যে, রোযা তো আল্লাহর জন্য রাখলে কিন্তু তার ইফতার করছ হারাম দিয়ে, সুদের টাকা দিয়ে, ঘুষের অর্থে কিংবা যে কোন হারাম আয়ের সাহায্যে। এ কেমন রোযা হলো যে,সাহরীও হারাম অর্থে,ইফতারও হারাম অর্থে আর তার মাঝখানে রোযা? এজন্য বিশেষভাবে এই মাসে হারাম জীবিকা থেকে বাঁচুন এবং আল্লাহ তাবারক ও তাআলার নিকট প্রার্থনা করুন যে, হে আল্লাহ! আমি হালাল রিযিক খেতে চাই, আমাকে হারাম থেকে বাঁচিয়ে দিন!

হারাম আয় থেকে বাঁচুন

কোন কোন সুধীজন এমন রয়েছেন, যাদের জীবিকার ব্যবস্থা মৌলিকভাবে আলহামদুলিল্লাহ হারাম নয়, বরং হালাল। অবশ্য যত্নশীল না হওয়ায় তাতে কিছু হারাম আয়েরও মিশ্রণ ঘটে যায়। এমন সুধীজনের পক্ষে হারাম আয় থেকে বেঁচে থাকা দুরূহ কাজ নয়। তারা কম চেয়ে কম এই মাসে সামান্য যত্নবান হোন, ইহতিমাম করুন এবং হারাম আয় থেকে বেঁচে থাকুন। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার যে, এই মাস সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে, এটি ধৈর্যের মাস, ভ্রাতৃত্ব ও সহানুভূতির মাস, একে অপরের প্রতি সমব্যথী হওয়ার মাস। অথচ এই মাসে ভ্রাতৃত্বের পরিবর্তে মানুষ উল্টো চামড়া খসানোর ধান্ধা করে। এদিকে রমযান মুবারক আসে আর ওদিকে পণ্যদ্রব্যের গুদামজাত করা শুরু হয়। অতএব অন্তত পক্ষে এই একটি মাসে নিজেকে এইসব হারাম কাজকর্ম থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।

আয়ের পদ্ধতি যদি সম্পূর্ণই হারাম হয়ে থাকে তবে?

কোন কোন সুধীজন থাকেন এমন, যাদের আয়ের ব্যবস্থা পুরোপুরিভাবেই হারাম। যেমন তারা কোন সুদী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। এ শ্রেণীর লোকজন এই মাসে কী করবেন? আমাদের হযরত ডাক্তার আবদুল হাই আরেফী সাহেব কাদ্দাসাল্লাহু সিররাহু—আল্লাহ তাআলা তাঁর দারাজাত বুলন্দ করুন আমীন!—প্রতিটি ব্যক্তির জন্যই উপায় বলে দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন, আমি এমন মানুষকে যাদের আয়ের

ব্যবস্থা পুরাপুরি হারাম—এই পরামর্শ দেই যে, যদি সম্ভব হয় ছুটি নিয়ে নিন এবং ন্যূনতম এই মাসের খরচের জন্য জায়েয এবং হালাল উপায়ের ব্যবস্থা করুন, কোন জায়েয আয়ের ব্যবস্থা বেছে নিন। যদি এটাও সম্ভব না হয় তাহলে এই মাসে খরচের জন্য কারো নিকট থেকে টাকা ধার করুন এবং এই নিয়ত করুন যে, এই মাসে হালাল থেকে খাবো এবং নিজের সন্তানদেরও হালাল খাওয়াবো। অন্তত এইটুকু অবশ্যই করুন।

গুনাহ থেকে বাঁচা সহজ

মোটকথা আমি একথা বলতে চাচ্ছিলাম যে, মানুষ তো এই মাসে নফল ইত্যাদির প্রতি বহু যত্নশীল থাকে, কিন্তু গুনাহ থেকে বাঁচার প্রতি যত্নবান হয় না। অথচ এই মাসে আল্লাহ তাআলা গুনাহসমূহ থেকে বাঁচার বিষয়টিকে সহজ করে দিয়েছেন। যেহেতু এই মাসে শয়তানকে বেড়ী পরিয়ে দেওয়া হয়, তাকে আবদ্ধ করে রাখা হয় তাই শয়তানের পক্ষ থেকে গুনাহ করার প্ররোচনা এবং উৎসাহ প্রদান বন্ধ হয়ে যায়। এজন্যই গুনাহ থেকে বাঁচা সহজ হয়ে যায়।

রোযার মাঝে ক্রোধ থেকে সংযত থাকা

তৃতীয় যে বিষয়টির সাথে রোযার বিশেষ সম্পর্ক, সেটি হলো ক্রোধ থেকে বিরত থাকা এবং সংযত থাকা। হাদীস শরীফে আছে যে, হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এই মাসটি ভ্রাতৃত্বের মাস, একে অপরের প্রতি সমব্যথী হওয়ার মাস। তাই ক্রোধ এবং ক্রোধের ফলে প্রকাশ পাওয়া অপরাধ ও গুনাহ, যেমন ঝগড়া-কলহ, মারপিট এবং গালাগালি, এইসব থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে যত্নবান হও। হাদীস শরীফে হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পর্যন্ত বলেছেন যে,

وان جهل على احدكم جاهل وهو صائم - فليقل انى صائم

[তিরমিযী, সপ্তম অধ্যায়, পরিচ্ছেদ—মা জা আ ফী ফযলিস সাওম, হাদীস নং ৭৬৪]

অর্থাৎ, যদি কোন ব্যক্তি তোমার সাথে মূর্খতা ও ঝগড়ার আচরণ করে তবে তুমি বলে দাও যে, আমি রোযার মাঝে আছি। আমি ঝগড়া করতে প্রস্তুত নই। আমি মুখেও ঝগড়া করতে প্রস্তুত নই, হাতেও ঝগড়া করতে প্রস্তুত নই।

এসব থেকে পরহেয করবেন। এগুলো মৌলিক বিষয়।

রমযানে নফল ইবাদত বেশী করবেন

ইবাদতের সম্পর্ক যতদূর, তাতে সকল মুসলমানই জানেন যে, রোযা রাখা, তারাবীহ্ পড়া আবশ্যকীয়। যেহেতু এই মাসের সাথে তেলাওয়াতে কুরআনের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে, যেহেতু হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামের সাথে কুরআনে করীমের দাওর করতেন, তাই বেশীর চেয়েও বেশী যতটুকু সম্ভব হয়, এই মাসে তেলাওয়াত করবেন। তেলাওয়াত ব্যতীত চলতে ফিরতে, উঠতে বসতে মুখে আল্লাহর যিকির করবেন। চলতে ফিরতে কালিমায়ে সুওম سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ والله اكبر এবং দরূদ শরীফ ও ইস্তেগফারের প্রতি অধিক পরিমাণ যত্নবান থাকবেন। যত অধিক পরিমাণ সম্ভব হয় নফল ইবাদত করবেন।

সাধারণ দিনগুলোতে রাতে উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড়ার সুযোগ হয় না। কিন্তু রমযানুল মুবারকে যেহেতু মানুষ সাহরীর জন্য উঠে থাকে, তাই সামান্য আগে উঠে যাবেন এবং সাহরীর পূর্বে তাহাজ্জুদের নিয়মিত কর্মরীতি বা মামূল বানিয়ে নিবেন। এই মাসে খুশূ বা আত্মিক বিগলনের সাথে এবং পুরুষগণ জামাতের সাথে নামায পড়ার ব্যাপারে যত্নবান হবেন। এইসব কাজগুলো তো এই মাসে করাই চাই। কারণ, এটা রমযানুল মুবারকের একান্ত বৈশিষ্ট্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এসব কিছুর চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে গুনাহসমূহ থেকে বাঁচার চিন্তা করা। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এই সকল বিষয়ের ওপর আমল করার তাওফীক দান করুন এবং রমযানুল মুবারকের নূর ও বরকতসমূহ থেকে সঠিকভাবে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন !

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

কুরআন নাযিল হওয়ার মাস

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و كفى وسلام على عباده الذين اصطفى

রমযানের অনন্য বৈশিষ্ট্য ঃ কুরআনের অবতরণ

রমযানের মুবারক মাসটি হলো আল্লাহ্ তাআলার রহমতসমূহের হেমন্তকাল। আল্লাহ তাআলা এই মাসকে যেসব বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং তাকে যেসব নূর ও বরকত দ্বারা ভূষিত করেছেন, তার যথাযথ হিসাব ও গণনা মানুষের জন্য সম্ভব নয়। রমযানের জন্য কোন ফযীলত যদি না–ও থাকতো, তবে এই ফযীলতটিই তার গুরুত্ব ও মহত্ত্বের জন্য যথেষ্ট হয়ে যেতো যে, আল্লাহ তাআলা কুরআনে করীম নাযিল করার জন্য এই মাসটিকে মনোনীত করেছেন। তাই আল্লাহ্ তাআলা রমযানের বৈশিষ্ট্যাবলী বয়ান করতে গিয়ে সবচেয়ে আগে এই বৈশিষ্ট্যটিকেই উল্লেখ করেছেন। এরশাদ হয়েছে ঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ

[রমযান সেই মাস, যার মাঝে কুরআনে করীম নাযিল করা হয়েছে।]

অতঃপর কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার জন্য রমযান মাসেও এমন একটি রাতকে মনোনীত করা হয়েছে, যেই রাতটিকে এই মুবারক মাসের আত্মা এবং তার বরকতসমূহের নির্যাস বলা উচিত। অর্থাৎ লাইলাতুল কদর।

তাই এরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ– وَ مَا اَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ – لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ –

[নিঃসন্দেহে আমি এই কুরআনকে লাইলাতুল কদরে নাযিল করেছি

এবং আপনি কি জানেন, লাইলাতুল কদর কী? লাইলাতুল কদর হাজার মাসের চেয়েও উত্তম।]

এমনিতে তো কুরআনে করীম সর্বদাই লওহে মাহফুজে বিদ্যমান এবং সরকারে দো আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর কুরআন একবারেই নাযিল হয়নি। বরং তেইশ বছরের মেয়াদে প্রয়োজন ও পরিস্থিতি অনুযায়ী অল্প অল্প করে কুরআন শরীফকে নাযিল করা হয়েছে।

লওহে মাহফুয থেকে বাইতুল মা'মূর ঃ

সেখান থেকে ....

কিন্তু আল্লাহ তাআলা কুরআনে করীমকে এই বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অবতরণ শুরু হওয়ার পূর্বেই তাকে একবারেই লওহে মাহফুয থেকে বাইতুল মা'মূরে নাযিল করেছেন।

বাইতুল মা'মূর ঊর্ধ্বজগতের ফেরেশতাগণের একটি ইবাদতগাহ। এখানে কুরআনে করীম নাযিল করার উদ্দেশ্য এটা ছিলো যে, এই দিনে কালামে এলাহীর এই উপহার উম্মতে মুহাম্মাদিয়াকে পৌছানোর জন্য লওহে মাহফুয থেকে বাইতুল মা'মূরে ফেরেশতাগণের কাছে অর্পণ করা হয়েছে, যেন তাঁরা আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী তার বিভিন্ন অংশ প্রয়োজন মুতাবেক সরওয়ারে দোআলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছাতে থাকেন। এভাবে লওহে মাহফুয থেকে বাইতুল মা'মূরে নাযিল করার এই বিরাট ঘটনাটি ঘটেছে রমযান মাসে এবং লাইলাতুল কদরে।

এরপর বাইতুল মা'মূর থেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর কুরআন অবতরণের সূচনার জন্য এই লাইলাতুল কদরকেই নির্বাচন করা হয়েছে।

অতএব হেরা গুহায় যে রাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর সবচেয়ে প্রথম ওহী নাযিল হয়েছে; সেই রাতটিও ছিলো লাইলাতুল কদর। নবুওয়তের পূর্বে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবাদতের জন্য হেরা গুহায় তাশরীফ নিয়ে যেতেন এবং সেই মুবারক গুহায় একাকীত্বে নিজের পরওয়ারদেগারের ইবাদত করতেন।

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

একবার সেই গুহায় হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তাশরীফ নিয়ে এলেন এবং হুযূর (সাঃ)কে বললেন ঃ 'ইকরা' অর্থাৎ পড়ো। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু উম্মী ছিলেন, তাই উত্তরে তিনি বললেন— ما انا بقارى অর্থাৎ আমি পড়তে জানি না। অতঃপর জিবরাঈল আমীন আলাইহিস সালাম হুযূর (সাঃ)এর সীনা মুবারকে জোরে চাপ দিলেন এবং দ্বিতীয় বার বললেন—ইকরা, অর্থাৎ পড়ো! তিনি আবারো সেই উত্তর দিলেন যে, আমি তো পড়তে জানি না। তখন জিবরাঈল আমীন আলাইহিস সালাম বললেন ঃ

اِقْـرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ - خَلَقَ الْاِنْسَـانَ مِنْ عَلَقٍ - اِقْـرَأْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ -

[পড়ো সেই পরওয়ারদেগারের নামে, যিনি মানুষকে জমাটবাঁধা রক্ত থেকে সৃষ্টি করেছেন। পড়ো এবং তোমার পরওয়ারদেগার বড়ই দয়াময় ; যিনি কলমের সাহায্যে এলম শিখিয়েছেন, যিনি মানুষকে সেইসব বিষয় শিখিয়েছেন, যা মানুষ জানতো না।

লাইলাতুল কদর ঃ কী এবং কখন?

এগুলো ছিলো কুরআনে করীমের সবচেয়ে প্রথম দিকের আয়াত ; যা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর নাযিল হয়েছে। এরপর হুযূর (সাঃ)–এর ওপর কুরআন অবতরণের এই ধারাবাহিকতা তেইশ বছর পর্যন্ত চালু থেকেছে।

যে রাতে হুযূর (সাঃ)এর ওপর কুরআন অবতরণের সূচনা হয়েছে, তা ছিলো লাইলাতুল কদর। কুরআনে করীম একথাও বলে দিয়েছে যে, এই আযীমুশ্বান কাজের জন্য শবে কদরকে এজন্য মনোনীত করা হয়েছে যে, এই রাত্রিটি তার ফযীলত এবং নূর ও বরকতের দিক থেকে হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। রেওয়ায়েতসমূহে আছে যে, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সামনে অতীত উম্মতসমূহের এমন কিছু ব্যক্তি ও লোকের কথা উল্লেখ করেছেন যারা দীর্ঘ বয়স পেয়েছেন এবং শত শত বছর পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার ইবাদত

করেছেন। তখণ কয়েকজন সাহাবীর অন্তরে এই খেয়াল সৃষ্টি হলো যে, তারা দীর্ঘ বয়স পেয়ে দীর্ঘকাল পর্যন্ত সওয়াব হাসিল করেছেন। কিন্তু আমরা যারা এত দীর্ঘ বয়স পাই না, তাদের সমান সওয়াব কিভাবে লাভ করবো? এর উত্তরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাইলাতুল কদর সম্পর্কিত এই আয়াতগুলো শোনালেন এবং বললেন, যাদের বয়স দীর্ঘ নয়, তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা এমন একটি রাত নির্ধারিত করে রেখেছেন, যে রাতে ইবাদতের সওয়াব হাজার মাসের ইবাদতের চেয়ে বেশী হয় এবং সেটাই শবে কদর। তবে যেহেতু শবে কদর একটি বিরাট নেয়ামত, যা এই উম্মতকে দান করা হয়েছে ; তাই এই নেয়ামতকে লাভ করার জন্য সামান্য অনুসন্ধান ও অন্বেষার প্রয়োজন বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং সেটা এভাবে যে, আল্লাহ তাআলা কোন নির্দিষ্ট তারিখ বলার পরিবর্তে এমন বলে দিয়েছেন যে, এই রাত রমযানের শেষ দশদিনের বেজোড় রাত্রিসমূহের কোন একটিতে হয়ে থাকে।

তাই রমযানের একুশতম রাত্রি থেকে ঊনত্রিশতম রাত্রি পর্যন্ত প্রতিটি বেজোড় রাত্রিতে শবে কদর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অতঃপর এই রাত্রিগুলোর মাঝেও সাতাশতম রাত্রির শবে কদর হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। একাধিক রেওয়ায়েতের আলোকে এটাই ছিলো সেই রাত্রি, যে রাতে কুরআন নাযিল হওয়ার একটি হেকমত এটাও জানা যায় যে, মুসলমান প্রতিবছর কুরআন নাযিল হওয়ার মত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার স্মারক রাত্রিটিকে জাগ্রত থেকে, আল্লাহ তাআলার ইবাদত করে, তার দরবারে দুআ করে এবং রোযা রেখে উদযাপন করুক, পালন করুক। এখানে একথাটিও জানা হয়ে গেছে যে, কোন আযীমুশ্বান ঘটনাকে স্মরণ করার জন্য সঠিক পন্থা এটা নয় যে, তার আনন্দে শুধু আলোকসজ্জা করা হবে অথবা কিছু উদ্দেশ্যহীন সভা–সমাবেশ অনুষ্ঠান করা হবে কিংবা তার স্মরণে খেল–তামাশা করা হবে। বরং স্মরণ উদযাপন এভাবে করা চাই, যার দ্বারা এই ঘটনার মূল লক্ষ্যটি মস্তিষ্কে সতেজ ও সজীব হয়ে উঠে, যার দ্বারা এই লক্ষ্যে জান ও মাল খরচ করার অনুভূতি সজাগ হয়ে যায় এবং যার সাহায্যে এই ঘটনার আসল আত্মাকে বজায় রাখা যায়।

www.banglakitab.weebly.com

www.islamfind.wordpress.com

শবে কদর উদযাপন ঃ সর্বোত্তম পন্থা কোন্‌টি?

তাই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কুরআন অবতরণের স্মরণকে উদযাপনের জন্য আলোকসজ্জা করা এবং সভা–শোভাযাত্রা বের করার পরিবর্তে শবে কদরের ইবাদতের হুকুম দিয়েছেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এই বিরাট মর্যাদাপূর্ণ ঘটনাটির স্মরণ সেইসব প্রথাগত প্রদর্শনীসমূহের সাহায্যে উদযাপন করার পরিবর্তে প্রথমত সে রাতে জাগ্রত থেকে এবং ইবাদত করে কাটিয়েছেন, দ্বিতীয়ত একবার বদরের ময়দানে বাতিলকে পর্যুদস্ত করে এই রাত্রিটিকে উদযাপন করেছেন।

কেননা গযওয়ায়ে বদরের আযীমুশ্বান ঘটনাটিও লাইলাতুল কদরেই ঘটেছিলো ; যার আলোচনা কুরআনে করীম এই শব্দগুলোর দ্বারা করেছে—

وَ مَا اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰن

[যদি তোমরা সেই কালামের ওপর ঈমান রাখ, যা আমি আমার বান্দার ওপর একটি সিদ্ধান্তকারী দিনে নাযিল করেছি। সেটি ছিলো ঐদিন, যেদিন হক–বাতিলের দুইটি জামাত পরস্পরে সংঘর্ষ করেছে।]

শবে কদর দ্বারা উপকৃত হওয়া এবং কুরআন অবতরণের শুকরিয়া আদায় করার সর্বোত্তম পন্থা এটা যে, প্রত্যেক মুসলমান যেন এই রাতে জাগ্রত থেকে ইখলাসের সাথে আল্লাহর ইবাদত করে, যতটুকু সম্ভব হয় যেন তাতে নফল নামাযসমূহ পড়ে, কুরআনে করীমের তেলাওয়াত করে, তাসবীহ ও যিকিরে মশগুল থাকে, আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করে এবং এ কথার অঙ্গীকার করে নেয় যে, যেই উদ্দেশ্যে কুরআনে করীম নাযিল হয়েছে, সেই উদ্দেশ্যকে হাসিল করবো এবং তার তাবলীগের জন্য আমি আমার জান ও মালের যেকোন ধরনের কুরবানী থেকে পিছপা হবো না।

আজ আবারো রমযানের সাতাশতম রাত এবং আমাদের সীমা–সংখ্যাহীন পাপাচার ও গুনাহ সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার রহমত এবং তওবা কবুলের দরজা এখনো বন্ধ হয়নি।

আসুন ! আজ কুরআন অবতরণের এই মুবারক রাতে অনুতাপ ও

অনুশোচনার অশ্রু দিয়ে আমাদের মন্দ আমলসমূহের কালোদাগ ধুয়ে ফেলি ; তওবা করি আমাদের লজ্জাজনক অতীত জীবন থেকে আর নুযূলে কুরআনের এই ইয়াদগারকে আমরা পালন করি এই নতুন অঙ্গীকার ও প্রত্যয়ের সাথে যে, ভবিষ্যতে আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটি নড়া-চড়া, উঠা-বসাকে আল্লাহর এই পবিত্র কিতাব এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত অনুযায়ী বানানের চেষ্টা করবো।

আজকের রাত নিজেদের পাপ-গুনাহ থেকে তওবা করার রাত আল্লাহ আমাদের হৃদয়ে নতুন এই অঙ্গীকার অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন।

আমরা যদি আজ অন্তরের একনিষ্ঠতা ও নিঃস্বার্থতার সাথে এই কাজ করি তাহলে বিশ্বাস করুন—দ্বীনী এবং দুনিয়াবী উন্নতির রাজপথে কয়েক বছরের দূরত্ব আমাদের কয়েক মুহূর্তেই অতিক্রম করা সম্ভব হয়ে যাবে। কবি বলেন—

وادی عشق بسے دور ودرازست ولے
طے شود جادہ صد سالہ بہ آھے گا ھے

দুআ কবুলের মাস

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و كفى وسلام على عباده الذين اصطفى

বিশেষ সময় ঃ বিশেষ রহমত

এমনিতে তো আল্লাহ্ তাআলার রহমতের ভাণ্ডার সকল সময়ে সকল মুহূর্তেই উন্মুক্ত। মানুষের মাঝে বন্দেগীর অনুভূতি এবং প্রার্থনার যোগ্যতা থাকলে অমুখাপেক্ষী প্রভু সকল সময়েই তাঁর বান্দাদের দুআসমূহ শুনেন এবং তাদের উদ্দেশ্য ও প্রার্থিত বিষয় পূরণ করে দেন। কুরআনে করীমের এরশাদ—

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّى فَإِنِّى قَرِيْب - أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ -

[এবং যখন আমার বান্দারা আপনাকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে তখন তাদের বলে দিন যে, আমি তাদের নিকটবর্তী। যখন কোন আহবানকারী আমার কাছে আহবান করে তখন আমি তাদের দুআ কবুল করি। তাই তাদের উচিত আমার কাছে তাদের প্রার্থনা করা এবং আমার ওপর তাদের ঈমান রাখা, যেন তারা হেদায়াত লাভ করে।]

কিন্তু রাত–দিনের এই নেযামের মধ্যে কিছু কিছু মুহূর্ত এমন আসে, যেসব মুহূর্তে আল্লাহ তাআলার রহমতের দরিয়ায় জোশ্ এসে যায়। সেই মুহূর্তগুলোতে অন্তর দিয়ে যা কিছু প্রার্থনা করা হয় আল্লাহ্ তাআলার রহমতে তা পাওয়াই যায়। হাদীসে আছে যে, কতক বিশেষ সময়ে আল্লাহ্ তাআলার রহমতের বিশেষ হাওয়া চালু হয়ে যায় এবং প্রত্যেক

ধনী–গরীব, সক্ষম–দুর্বল, মর্যাদাশীল ও তুচ্ছ নির্বিশেষে সব মানুষের আঁচল ভরে দেয়।

বেশী বেশী দুআ ঃ সর্বোত্তম পন্থা

রমযানুল মুবারক মাস খুদাবন্দী রহমতের সেইসব হাওয়ারই হেমন্তকাল। এই মাসে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। বান্দাদের মাগফিরাতের জন্য বাহানা তালাশ করা হয় এবং কদমে কদমে দুআসমূহ কবুল হওয়ার ঘোষণা করা হয়। এজন্যই এই মাসটি দুআ কবুল হওয়ার মাস। এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার সর্বোত্তম পন্থা এটাই যে, এই মাসে মানুষ যেন অধিক পরিমাণে দুআ করে এবং আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে নিজের প্রয়োজন ও প্রার্থিত বিষয়সমূহ চাইতে থাকে।

হাদীসসমূহে দুআ কবুলের বর্ণনা

মুজামে তিবরানীতে হযরত উবাদা ইবনে ছামেত (রাদিঃ)এর সূত্রে রেওয়ায়েত আছে যে, একবার রমযান মাসের শুরুতে হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা এই মাসে তোমাদের দিকে খাসভাবে মুতাওয়াজ্জিহ হন এবং বিশেষ বিশেষ রহমত নাযিল করেন, গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন, দুআসমূহ কবুল করেন, নেকীসমূহের ক্ষেত্রে তোমাদের প্রতিযোগিতাপূর্ণ উৎসাহ লক্ষ্য করেন এবং ফেরেশতাগণকে বলেন যে, দুর্ভাগা সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি এই মাসে আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। [তারগীব]

মুসনাদে বাযযারের একটি হাদীসে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাদিঃ) সরকারে দোআলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদটি নকল করেছেন যে, রমযানের প্রতিটি দিনে ও রাতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে (জাহান্নামের) কয়েদীদের মুক্তি দেওয়া হয় এবং রমযানের প্রতিটি দিনে ও রাতে প্রত্যেক মুসলমানের একটি দুআ অবশ্যই কবুল হয়ে থাকে। অতঃপর রমযানুল মুবারকের কিছু বিশেষ মুহূর্তও দুআ কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকারিতা ও প্রভাব রাখে।

দুআর বিশেষ মুহূর্ত

সবচেয়ে আগে সেই দুআ, যা রোযা অবস্থায় করা হয়, হাদীসে তার কবুল হওয়ার ওয়াদা করা হয়েছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ হলো, তিন ব্যক্তির দুআ ফেরত আসে না। প্রথম রোযাদারের দুআ ইফতারপূর্ব পর্যন্ত, দ্বিতীয় ন্যায়পরায়ণ শাসকের দুআ, তৃতীয় মযলুমের দুআ। এই দুআকে আল্লাহ তাআলা মেঘমালা থেকেও উপরে উঠিয়ে নেন এবং তার জন্য আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে এরশাদ হয় যে, অবশ্যই আমি তোমার মদদ করবো, (কোন মসলেহাতের কারণে) দেরী হয়ে গেলেও। [তারগীব—মুসনাদে আহমদ, ইবনে খুযাইমা ও ইবনে হিব্বান–এর সূত্রে]

তাছাড়া কোন কোন রেওয়ায়েতে ইফতারের সময়ে কৃত দুআও কবুল করার ওয়াদা করা হয়েছে। তাই সাহাবায়ে কেরাম এবং বুযুর্গানে দ্বীনের মা'মূল বা কর্মনীতি এটাই থেকেছে যে, এ সময়ে তাঁরা সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক কোন দুআ করার প্রতি যত্নবান থাকতেন।

উপরন্তু রমযানের রাতে তারাবীহ এবং তাহাজ্জুদের পর হচ্ছে দুআর বিশেষ সময় এবং এই সময়গুলোতে দুআর ইহতিমাম করা চাই। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রমযানের প্রতিটি রাতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করতে থাকে যে, হে কল্যাণের অন্বেষণকারী সামনে এসো! এবং হে মন্দের অন্বেষণকারী পিছনে হটে যাও! এরপর সেই ফেরেশতা এই আওয়ায দিয়ে থাকেন যে, আছে কোন মাগফিরাত প্রত্যাশী, যার মাগফিরাত করা হবে? আছে কোন তওবাকারী, যার তওবা কবুল করা হবে? আছে কোন প্রার্থী, যার প্রার্থনা পূরণ করা হবে? সর্বোপরি এই ঘোষণার ধারাবাহিকতা প্রতি রাতেই জারি থাকে।

মোটকথা হলো, রমযানের রাত্রি–দিন দুআ ও মুনাজাতের রাত্রি–দিন। এজন্যই এই মাসের নির্দিষ্ট ইবদাতসমূহ ব্যতীত এই মাসে যখন.এবং যে সময় সুযোগ হয় আল্লাহ তাআলার দরবারে দুআ করার প্রতি যত্নবান হওয়া চাই। এই আমলের দ্বারা মানুষের উদ্দেশ্য তো পূরণ হবেই। উপরন্তু এর বিরাট একটি ফায়েদা এই হয় যে, আল্লাহ তাআলার

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

সাথে বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টি হয় এবং ধীরে ধীরে এই সম্পর্ক মানুষকে নেকীর কাজে অভ্যস্ত এবং মন্দকাজ থেকে দূরবর্তী করে দেয়।

দুআ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য তিনটি বিষয়

কখনো কখনো মানুষের মনে এই ধারণার জন্ম হয় যে, আমরা রমযানে অমুক দুআ করেছিলাম কিন্তু তা কবুল হয়নি। তাই এ প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় স্মরণ রাখা চাই। প্রথম বিষয়টা হলো, দুআ এই জিনিসের নাম নয় যে, কোন মনোযোগ ছাড়াই কয়েকটি শব্দ যবানে প্রকাশ করা হবে। বরং দুআ হচ্ছে এই জিনিস যে, একজন বান্দার মত পরিপূর্ণ অক্ষমতা ও মুখাপেক্ষীতা প্রকাশ করে এবং অন্তর লাগিয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে নিজের প্রার্থিত বিষয়গুলো চাওয়া হবে। হাদীসে আছে যে, আল্লাহ তাআলা সেই দুআ কবুল করেন না, যা অন্তরের উদাসীনতার সাথে প্রার্থনা করা হয়। সুতরাং যখনই দুআ করা হয় আত্মিক উপস্থিতি ও আত্মিক ধ্যানের সঙ্গেই যেন করা হয়।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, হারাম খাদ্যের সাথে দুআ কবুল হয় না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ হলো, বহু সংকটগ্রস্থ লোক আকাশের দিকে হাত উঠিয়ে দুআ করে থাকে এবং ইয়া রব ইয়া রব করে থাকে, কিন্তু তাদের খাওয়া–দাওয়া হারাম, পান করা হারাম এবং পোশাক হারাম হয়ে থাকে। এমন অবস্থায় তাদের দুআ কিভাবে কবুল হবে? তাই কমচেয়ে কম রমযান মাসে এই ব্যাপারে বিশেষ যত্নবান হওয়া চাই যে, মানুষের রুজি ও জীবিকা যেন হালাল হয়।

তৃতীয় বিষয় হচ্ছে, দুআ কবুল হওয়ার সঠিক অর্থ ও মর্মও বুঝে নেওয়া চাই। কখনো কখনো মানুষ নিজে মূর্খতার কারণে এমন জিনিস প্রার্থনা করে, যা তার জন্য উপকারী ও কল্যাণকর নয়। এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাআলা সেই প্রার্থিত বস্তুর পরিবর্তে বান্দাকে এমন বস্তু দান করেন, পরিণামে ও পরিশেষে সেটা তার জন্য হয় কল্যাণকর ও উপকারী। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ হলো, যখন মুসলমান দুআ করে তখন যতক্ষণ পর্যন্ত সে আত্মীয়তা ছিন্ন করা কিংবা কোন গুনাহর দুআ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার পক্ষ

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

থেকে তিনটি জিনিসের যে কোন একটি জিনিস সে অবশ্যই লাভ করে। হয় ঠিক সেই জিনিসই লাভ করে যার প্রার্থনা সে করেছে, অথবা তার পরিবর্তে কোন মন্দ বা বিপদ তার থেকে দূর করে দেওয়া হয় কিংবা আখেরাতে ততটুকুই সওয়াব তার ভাগে দিয়ে দেওয়া হয়।

দুআ নিষ্ফল হয় না

অতএব কোন প্রার্থিত বস্তু যদি কোন সময় না পাওয়া যায় তাহলে এমন মনে করা উচিত না যে, দুআ কবুল হয়নি অথবা দুআ বিফলে গেছে। বরং দুআ যদি তার আদবসমূহের দিকে লক্ষ্য রেখে করা হয় তবে তা কখনো নিষ্ফল ও উপকারহীন থাকে না এবং তার ফলে তাই হয়ে থাকে, যা পরিণামে মানুষের জন্য কল্যাণকর ও উপকারী হয়।

শেষ কথা হলো এই যে, রমযানের দুআসমূহকে কেবল নিজের ব্যক্তিগত পর্যায় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ না রাখা চাই। বরং নিজে ব্যতীত নিজের প্রিয়জন, নিকটজন, বন্ধু–বান্ধব, নিজের দেশ ও জাতি এবং গোটা আলমে ইসলামীর সুস্থতা ও কামিয়াবীর জন্য দুআ করা চাই। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে রমযানের মুবারক মুহূর্তগুলি থেকে উপকার লাভ করার তাওফীক দান করুন। আমীন !

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

রোযা ও যাকাতের মাসায়েল

রমযান মাসে রোযা রাখা ইসলামের তৃতীয় ফরয। যে ব্যক্তি রমযানের রোযা ফরয হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে সে মুসলমান থাকে না। আর যে রোযার ফরযকে স্বীকার করে কিন্তু রোযা রাখে না, সে মারাত্মক গোনাহগার–ফাসেক।

রমযান শরীফের রোযা পাগল ও নাবালেগ ব্যতীত সকলের উপর ফরয। স্ত্রী–পুরুষ, ধনী–দরিদ্র, অন্ধ, বধির, শ্রমিক সকলকেই রোযা রাখতে হবে। শরীয়তে বর্ণিত উযর–অপারগতা ব্যতীত রমযানের রোযা না রাখা কারও জন্যে দুরুস্ত নয়।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের দু'মাস আগে থেকেই দো'আ করতে থাকতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى رَجَبْ وَ شَعْبَانَ وَ بَلِّغْنَا رَمَضَانْ

"হে আল্লাহ রজব ও শাবান মাসে আমাদের জন্য বরকত দাও এবং আমাদেরকে রমযান মাসে পৌঁছিয়ে দাও।" অর্থাৎ রমযান মাস যেন আমরা পেতে পারি, রমযানের বরকত, ফযীলত ও কল্যাণ থেকে যেন আমরা মাহরূম না হই।

রমযান মাস ঃ গুরুত্ব ও ফযীলত

বস্তুতঃ রমযান মাস হচ্ছে, আল্লাহর রহমত ও দয়া–অনুগ্রহের মাস। রমযান মাস হচ্ছে, বান্দার গোনাহ মাফ পাওয়ার মাস। রমযান মাস হচ্ছে, দোযখের আগুন থেকে মুক্তি পাওয়ার মাস। রমযান মাস হচ্ছে, অধিক নেকী কামাই করার মাস। এ মাসে একটি ফরয অন্য মাসের ৭০টি ফরযের সমান। এ মাসে একটি নফল অন্য মাসের একটি ফরযের সমান।

রমযান মাস সবর ও ধৈর্য্যের মাস, সবর ও ধৈর্য্যের পুরস্কার হচ্ছে জান্নাত। রমযান মাস মানুষের প্রতি দরদ ও সমবেদনার মাস। যে ব্যক্তি

এই মাসে তার গোলাম (কাজের লোক ও খাদেম)এর কাজের বোঝা হালকা করে দিবে, আল্লাহ তাআলা তাকে মাফ করে দিবেন—জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করে দিবেন। মাহে রমযানের বরকত ও কল্যাণের এই কথাগুলো হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে, এই মাসে মুমিনের রিযিক বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি এই মাসে কোন রোযাদারকে ইফতার করাবে, এই ওসীলায় তার গোনাহ মাফ হবে, জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ হবে এবং ঐ রোযাদারের সওয়াবের সমান সওয়াব সেও লাভ করবে ; অথচ রোযাদারের সওয়াব মোটেই কমানো হবে না। এমনকি সামান্য খেজুর কিংবা এক ঢোক পানি কিংবা এক চুমুক দুধ দিয়ে ইফতার করালেও এই ফযীলত হাসিল হবে।

হাদীস শরীফে এ কথাও বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি রোযাদারকে পানি পান করাবে আল্লাহ তাআলা (কিয়ামতের দিন) তাকে আমার হাউজ (হাউজে-কাওছার) থেকে এমন পানি পান করাবেন যে, জান্নাতে যাওয়া পর্যন্ত সে কখনও পিপাসা অনুভব করবে না।

এ মাসে চারটি কাজ বেশী বেশী করার হুকুম করা হয়েছে ঃ

১. কালেমা তাইয়্যিবাহ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (মাঝে মাঝে) মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ পড়া।

২. ইস্তেগফার (আস্তাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়া আতূবু ইলাইহ্) করা অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা চাওয়া।

৩. আল্লাহ তাআলার কাছে জান্নাতের দরখাস্ত করা (আল্লাহুম্মা ইন্না নাছ্আলুকাল জান্নাহ)।

৪. জাহান্নামের আগুন থেকে পানাহ চাওয়া (ওয়া নাঊযু বিকা মিনান নার)—দ্রঃ ফাঃ আ'মাল

রোযা

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ “তোমরা নিশ্চয় জেনে রাখ, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রমযান

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

শরীফের রোযা ফরয করেছেন এবং রমযানের রাতে তারাবীহ্‌র নামায সুন্নত করে দিয়েছেন। অতএব যে ব্যক্তি খালেছ নিয়তে, ঈমানের সাথে শুধু সওয়াবের আশায় এই মাসে দিনের বেলায় রীতিমত রোযা রাখবে এবং রাতে রীতিমত তারাবীহ্‌র নামায পড়বে, তার বিগত সব (ছগীরা) গোনাহ মিটিয়ে দেওয়া হবে।" —নাসায়ী, বায়হাকী

হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ আমার উম্মতকে রমযান মাসে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে দান করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী উম্মতদের নসীব হয় নাই ঃ–

১. রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ তাআলার নিকট মিশকের ঘ্রাণের চাইতেও বেশী প্রিয়।

২. তাদের জন্য সাগরের মাছেরা পর্যন্ত দুআ করে এবং তা ইফতার পর্যন্ত চলতে থাকে।

৩. তাদের জন্য জান্নাত প্রতিদিন সাজানো হয়। অতঃপর আল্লাহ তাআলা জান্নাতকে বলেন, শীঘ্রই আমার নেক বান্দাগণ তাদের দুঃখ–কষ্ট থেকে মুক্ত হয়ে তোমার দিকে চলে আসছে।

৪. অবাধ্য–উশৃংখল শয়তানদেরকে বন্দি করে রাখা হয়, ফলে তারা মন্দ কাজ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না, সেগুলোর দিকে পূর্বে পৌঁছতে পারতো।

৫. রমযান মাসের শেষ রাতে রোযাদারদের ক্ষমা করে দেওয়া হয়। সাহাবীগণ আরজ করলেন, তাহলে এটা কি শবে কদর? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ না, বরং নিয়ম এই যে, শ্রমিককে মজুরী দেওয়া হয় কাজ শেষ করার পরই।

—আহমদ, বায়হাকী, তারগীব

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা খুতবা দেওয়ার জন্য যখন প্রথম সিঁড়িতে কদম মোবারক রাখেন তখন জিব্রাঈল (আঃ) বলেছিলেন, ধ্বংস হোক ঐ ব্যক্তি যে পবিত্র রমযান মাস পেল তবুও সে আল্লাহর কাছে গোনাহ মাফ করিয়ে নিতে পারলো না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন 'আমীন' বলেছিলেন। —বুখারী শরীফ

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

অতএব হতভাগা ঐ সমস্ত লোক যারা রমযান মাস পেয়েও আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে বঞ্চিত রয়ে গেল।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ "রমযান মাসের প্রতি দিন এবং প্রতি রাতে আল্লাহ তাআলা কতক বান্দাকে (জাহান্নাম থেকে) মুক্তি দিয়ে থাকেন। এমনিভাবে প্রতিদিন ও প্রতি রাতে প্রত্যেক মুসলমানের কমপক্ষে একটি দুআ অবশ্যই কবূল হয়।" —তারগীব

হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "বহু রোযাদার এমন রয়েছে, যাদের রোযার (ভূকা–ফাকা থাকার) কষ্ট ব্যতীত কিছু লাভ হয় না। অনুরূপ, বহু রাত্র–জাগরণকারী এমন রয়েছে, যাদের রাত্র–জাগরণের কষ্ট ব্যতীত কিছুই লাভ হয় না।" —ইবনে মাজাহ, নাসাঈ

অর্থাৎ, রোযা রেখেও পাপ কাজ থেকে বিরত হলো না, হারাম মাল দ্বারা ইফতার করলো, গীবতে লিপ্ত হলো। অনুরূপভাবে রাত্রি জাগ্রত অবস্থায় কাটালো কিন্তু আনন্দচ্ছলে গীবত করে ফেললো, ফজরের নামাযই হয়তো বা কাযা করে দিল ইত্যাদি।

হযরত আবূ উবাইদাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—রোযা হচ্ছে ঢালস্বরূপ, যতক্ষণ না এ ঢালকে ফেড়ে ফেলা হয়।"

—ইবনে মাজাহ, নাসাঈ

অর্থাৎ ঢালের সাহায্যে যেমন শত্রু থেকে আত্মরক্ষা করা হয়, তেমনি রোযার সাহায্যেও শয়তানের কবল থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু পাপাচারে লিপ্ত হলে রোযার এই ঢালকে নিজেই ফেড়ে ফেলা হলো।

বস্তুতঃ রোযার অর্থই হলো, খানা থেকে বাঁচা, পান করা থেকে বাঁচা, কাম–বাসনা থেকে বাঁচা —এই তিনটা থেকে বাঁচা রোযার জন্য জরুরী। চিন্তা করলে দেখা যায়—এই তিনটি কাজ মূলতঃ হালাল ; খানা হালাল, পান করা হালাল, মিয়া–বিবির সম্ভোগ হালাল। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে, রোযা অবস্থায় এসব হালাল কাজগুলো থেকে তো বেঁচে থাকা হয়, কিন্তু যে সব কাজ পূর্ব থেকে হারাম, যেমন মিথ্যা বলা, গীবত

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

করা, অসংযত দৃষ্টি করা ইত্যাদি—এসব পূর্ব থেকেই হারাম থাকা সত্ত্বেও রোযা অবস্থায় যদি এগুলো থেকে বাঁচা না হয়, তবে এটা কি রোযা হওয়ার যোগ্যতা রাখে!

খাঁটি ও পরিপূর্ণ রোযা

তত্ত্বজ্ঞানী মাশায়েখ ও বুযুর্গানে দ্বীন পরিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ রোযার জন্য কুরআন–হাদীসের সার–নির্যাসস্বরূপ ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। প্রত্যেক রোযাদারের কর্তব্য এইগুলোর প্রতি বিশেষ যত্নবান হয়ে রোযাকে খাঁটি করে নেওয়া।

১. **চক্ষুর হেফাযত** ঃ যেন কোন নাজায়েয জিনিসের প্রতি দৃষ্টি না পড়ে। এমনকি রোযা অবস্থায় নিজের বিবির প্রতিও খাহেশাতের দৃষ্টি না করা। অনুরূপ খেল–তামাশা ইত্যাদির প্রতি এবং অহেতুক কোন বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত না করা।

২. **জবানের হেফাযত** ঃ মিথ্যা, চোগলখুরী, বেহুদা কথাবার্তা, গীবত–পরনিন্দা, অশ্লীল কথা, ঝগড়া–বিবাদ ইত্যাদি সবকিছু থেকে বিরত থাকা এবং বেঁচে চলা।

৩. **কানের হেফাযত** ঃ যাবতীয় নিন্দনীয় বিষয়, যা মুখে বলা নাজায়েয, সেগুলোর প্রতি কান লাগানোও নাজায়েয—এগুলো থেকে বেঁচে থাকা। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

“গীবতকারী এবং শ্রবণকারী উভয়ই গোনাহের মধ্যে সমান অংশীদার হয়।”

৪. **শরীরের অন্যান্য অঙ্গ–প্রত্যঙ্গকে গোনাহের কাজ থেকে বিরত রাখা** ঃ যেমন হাতকে নাজায়েয বস্তু ধরা থেকে, পা–কে নাজায়েয কাজের দিকে চলা থেকে, পেটকে সন্দেহযুক্ত খাবার থেকে মুক্ত রাখা ইত্যাদি।

৫. **হালাল ইফতারীও পেট ভর্তি করে না খাওয়াঃ** কেননা, এ দ্বারা রোযার আসল উদ্দেশ্য অর্থাৎ কামশক্তি ও পশু–প্রবৃত্তির দমন এবং নূরানী ও আধ্যাত্মিক শক্তি বর্ধনের বিষয়টি নষ্ট হয়ে যায়।

৬. **সর্বদা মনে মনে ভয় রাখা যে, না জানি আমার রোযা কবূল হচ্ছে**

কি-না ঃ বস্তুতঃ প্রত্যেক আমলের ব্যাপারেই এই খেয়াল রাখা চাই যে, আমার দ্বারা এমন কোন ত্রুটি বা অন্যায় হয়ে গেল কি–না, যদ্দরুন আমার আমল আমার মুখের উপর নিক্ষেপ করে দেওয়া হয়—যেমন হাদীস শরীফে এইরূপ বর্ণিত হয়েছে। —ফাযায়েলে আমাল

রোযার নিয়ত

মাসআলা ঃ সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযার নিয়তে পানাহার ও সহবাস থেকে বিরত থাকাকে শরীয়তের পরিভাষায় 'রোযা' বলে।

নিয়ত বলা হয় অন্তরের ইচ্ছা–এরাদাকে—যবানে কিছু বলা হোক বা না হোক। শুধু মনে মনে চিন্তা করে সংকল্প করা যে, আমি আজ আল্লাহর নামে রোযা রাখবো এবং কিছু পানাহার বা স্ত্রী ব্যবহার করবো না—এতে রোযা হয়ে যাবে। কিন্তু কেউ যদি মনের চিন্তা ও সংকল্পের সাথে মুখেও বাংলায় বা আরবীতে নিয়ত পড়ে নেয় যে, 'আমি আল্লাহর নামে রোযা রাখার নিয়ত করছি' তবে তা–ও ভাল। আরবী নিয়ত এই ঃ–

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ غَدًا مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكْ

"আমি পবিত্র রমযান মাসের আগামীকল্য রোযা রাখার নিয়ত করলাম।"

উপরোক্ত এই নিয়ত অর্থাৎ মনে মনে রোযার এরাদা করা রোযার জন্য শর্ত। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, কোন ব্যক্তি সারাদিন কিছু না খেয়ে এবং কিছু পান না করে কাটিয়ে দিল—হয়ত ক্ষুধাই লাগে নাই বা অন্য কোন কারণে খাওয়ার সুযোগ হয় নাই অর্থাৎ পূর্ব থেকেই তার রোযার কোন ইচ্ছা ছিল না, এতে তার রোযার নিয়ত না থাকার কারণে রোযা হবে না ; বরং এটা তার এমনিতেই উপাস থাকা হয়ে গেল।

মাসআলা ঃ রমযানের রোযার নিয়ত রাত থেকে করে নেওয়া উত্তম। যদি কেউ রাতে নিয়ত না করে তবে দিনের বেলায় সূর্য ঢলার দেড় ঘন্টা পূর্ব পর্যন্ত নিয়ত করতে পারে, তবে শর্ত হলো, দিনের বেলায় নিয়ত করার আগ পর্যন্ত কোন প্রকার খানা–পিনা না হওয়া চাই। —শামী

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

মাসআলা ঃ শরীয়ত অনুসারে সুবহে সাদেক থেকে রোযা শুরু হয়, কাজেই সুবহে সাদেকের আগ পর্যন্ত খাওয়া, পান করা, স্ত্রী ব্যবহার ইত্যাদি সব জায়েয আছে। অনেকে শেষ রাত্রে সেহরী খাওয়ার পর এবং রোযার নিয়ত করার পর রাত্রি থাকা সত্ত্বেও কিছু খাওয়া-দাওয়া বা স্ত্রী ব্যবহার নাজায়েয মনে করে—এটা ভুল। সুবহে সাদেক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত—নিয়ত করুক বা না করুক —এসব জায়েয আছে। তবে সুবহে সাদেক হয়ে যাওয়ার সন্দেহ হলে এসব করা চাই না। —বেহেশতী জেওর

যেসব কারণে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়

মাসআলা ঃ কানে ঔষধ বা তেল ঢাললে, নাকে ঔষধ ঢাললে বা নস্য টানলে, অথবা পায়খানার জন্য ডুস নিলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়। পরে কাযা করতে হবে।—হেদায়া

মাসআলা ঃ রোযা অবস্থায় পেশাবের রাস্তায় ঔষধ টপকানো বা তেল ইত্যাদি টপকানো দুরুস্ত নাই। এরূপ করলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং কাযা করতে হবে। — বেহেশতী জেওর

মাসআলা ঃ দাঁত দিয়ে রক্ত বের হওয়ার পর থুথুর সঙ্গে সেই রক্ত গিলে ফেললে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে ; কাযা করতে হবে। কিন্তু রক্ত যদি থুথুর চেয়ে কম হয়—অর্থাৎ এতে রক্তের স্বাদ পাওয়া না যায়,তবে রোযা ভঙ্গ হবে না।—আলমগীরী

মাসআলা ঃ ভুলে খাওয়া-দাওয়া করে ফেললে রোযা যায় না কিন্তু এরূপ করার পর রোযা ভঙ্গ হয়ে গেছে মনে করে যদি কিছু খায়, তবে রোযা অবশ্য ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং কাযা করতে হবে। —আলমগীরী

মাসআলা ঃ 'এখনও রাত আছে, সুবহে সাদেক হয় নাই' মনে করে যদি সেহরী খায় ; পরে জানতে পারে যে, ঐ সময় রাত ছিল না, তবে ঐ রোযা সহীহ হবে না। এমনিভাবে 'সূর্য ডুবে গেছে' মনে করে যদি ইফতার করে ফেলে; পরে জানতে পারে যে, সূর্য ডুবে নাই, তবে ঐ রোযা সহীহ হবে না। উভয় অবস্থাতেই রোযার কাযা করতে হবে। —আলমগীরী

মাসআলা ঃ সুরমা অথবা তেল লাগিয়ে অজ্ঞতাবশতঃ যদি কেউ মনে করে যে, তার রোযা ভেঙ্গে গেছে এবং এই কারণে ইচ্ছা করে কিছু

খাওয়া–দাওয়া করে, তবে কাযা ও কাফ্‌ফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে।
—আলমগীরী

মাসআলা ঃ লোবান বা আগরবাতি জ্বালিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে এগুলোর ধোঁয়া গ্রহণ করলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। বিড়ি সিগারেট বা হুক্কার ধোঁয়া পান করলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আতর ইত্যাদির খোশবূতে রোযা ভঙ্গ হবে না।—শামী

মাসআলা ঃ দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাদ্যদ্রব্য খেলাল বা জিহ্বার দ্বারা বের করে মুখ থেকে বাইরে না এনে গিলে ফেললে যদি ঐ খাদ্যদ্রব্য একটি বুটের পরিমাণ অথবা বেশী হয়, তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে ; কাযা করতে হবে। আর যদি একটি বুট অপেক্ষা কম হয় তবে রোযা ভঙ্গ হবে না। আর যদি মুখ থেকে বাইরে এনে তারপর গিলা হয়, তবে তা একটি বুটের পরিমাণের চেয়ে কম হলেও রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে ; কাযা করতে হবে, কাফফারা নয়। —শামী

মাসআলা ঃ সেহরী খেয়ে পান মুখে দিয়ে চিবাতে চিবাতে ঘুমিয়ে পড়লে এবং পান মুখে থাকা অবস্থাতেই সকাল হয়ে গেলে এই রোযা শুদ্ধ হবে না। পরবর্তীতে একটি রোযা কাযা করতে হবে। —শামী

মাসআলা ঃ কুল্লি করার সময় গলার ভিতর পানি চলে গেলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে—রোযার কথা স্মরণ থাকুক বা না থাকুক। এই রোযা কাযা করতে হবে। —শামী

মাসআলা ঃ ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ ভরে বমি করলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর অল্প বমি করলে রোযা ভঙ্গ হবে না। —শামী

মাসআলা ঃ যদি একটি কংকর অথবা একটি লোহার বা সীসার গুলি অথবা এমন কোন জিনিস গিলে ফেলা হয়, যা সাধারণতঃ লোকেরা খাদ্যরূপেও খায় না বা ঔষধরূপেও সেবন করে না, তবে এতে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং একটি রোযা কাযা করতে হবে। আর যদি এমন কোন জিনিস গিলে ফেলা হয়, যা লোকে খাদ্যরূপে খায় বা পানীয়রূপে পান করে কিংবা ঔষধরূপে সেবন করে, তবে রোযা কাযাও করতে হবে এবং কাফ্‌ফারাও দিতে হবে। —হেদায়া

মাসআলা ঃ রোযা রেখে দিনের বেলায় স্ত্রী–সহবাস করলে এমনকি

খৎনাস্থান প্রবেশ করলেও বীর্যপাত হোক বা না হোক রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং কাযা ও কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ প্রসূতির প্রস্রাবদ্বারে ধাত্রী আঙ্গুল ঢুকিয়ে কিংবা নিজেই নিজের যোনিতে আঙ্গুল ঢুকিয়ে অতঃপর সম্পূর্ণ আঙ্গুল কিংবা আংশিক বের করার পর আবার যদি ঢুকায়, তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি বের করার পর আবার না ঢুকায় তবে রোযা ভঙ্গ হবে না। অবশ্য পানি ইত্যাদি দ্বারা আঙ্গুল আগে থেকেই ভিজা থাকলে প্রথমবার ঢুকানোর দ্বারাই রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। —আলমগীরী

মাসআলা ঃ স্ত্রীকে হাত লাগানো বা পেয়ার করার দরুন বীর্যপাত হয়ে গেলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং কাযা করতে হবে।

মাসআলা ঃ রমযান মাসে কোন কারণবশতঃ রোযা ভঙ্গ হয়ে গেলে দিনের বেলায় কিছু খাওয়া-দাওয়া দুরুস্ত নয় ; সমস্ত দিন রোযাদারের ন্যায় না খেয়ে থাকা ওয়াজিব।—আলমগীরী

যেসব কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না মাকরূহ হয়

মাসআলা ঃ জিহ্বার অগ্রভাগ দিয়ে কোন জিনিসের শুধু একটু স্বাদ দেখে থুথু ফেলে দিলে রোযা ভঙ্গ হয় না ; কিন্তু বিনা দরকারে এরূপ করা মাকরূহ। অবশ্য কারও স্বামী যদি জালেম পাষাণ হৃদয় হয় যে, ছালুনে লবণ একটু কম-বেশী হলে জুলুম শুরু করে, তবে এরূপ করা মাকরূহ নয়। —আলমগীরী, শামী

মাসআলা ঃ রোযা অবস্থায় শিশুর খাওয়ার জন্য কিছু চিবিয়ে দেওয়া মাকরূহ। অবশ্য শিশুর জীবন ওষ্ঠাগত হলে এবং অন্য কেউ চিবিয়ে দেওয়ার মত না থাকলে চিবিয়ে দিয়ে মুখ পরিষ্কার করে ফেলা জায়েয আছে।—শামী

মাসআলা ঃ রোযা রেখে দিনের বেলায় স্বামী-স্ত্রীর এক সঙ্গে শোয়া, হাত লাগানো, পেয়ার মহব্বত করা—এতে যদি কাম-ভাব প্রবল হয়ে সহবাসের আশংকা হয়, তবে এরূপ করা মাকরূহ। — বেহেশতী জেওর

মাসআলা ঃ রাতে গোসল ফরয হলে সুবহে সাদেকের পূর্বেই গোসল

করে নেওয়া উচিত কিন্তু গোসল করতে দেরী করলে কিংবা সারা দিন গোসল না করলে যদিও রোযা ভঙ্গ হবে না কিন্তু অকারণে দেরী করার জন্য পৃথক গোনাহ হবে। — বেহেশতী জেওর

মাসআলা ঃ রোযা অবস্থায় কয়লা, মাজন, ছাই, বালু, টুথপেস্ট দ্বারা দাঁত মাজা মাকরূহ। এর কিছু অংশ যদি হলকূমের নীচে চলে যায়, তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে।— বেহেশতী জেওর

মাসআলা ঃ সিংগা লাগানো, রোগীর জন্য নিজের রক্ত দেওয়া, যা আজকাল ডাক্তারদের মধ্যে প্রচলিত—মাকরূহ।—জাওয়াহিরুল-ফিক্হ

মাসআলা ঃ গীবত অর্থাৎ পরনিন্দা সর্বাবস্থায়ই হারাম—রোযা অবস্থায় আরও কঠিন গোনাহ হয়। —জাওয়াহিরুল-ফিক্হ

মাসআলা ঃ রোযা অবস্থায় ঝগড়া-বিবাদ করা, গালি দেওয়া—কোন মানুষকে গালি দেওয়া হোক কিংবা কোন প্রাণী বা নিষ্প্রাণ বস্তুকে—এ দ্বারা রোযা মাকরূহ হয়ে যায়।—জাওয়াহিরুল-ফিক্হ

যেসব কারণে রোযা ভঙ্গও হয় না মকরূহও হয় না

মাসআলা ঃ রোযা রেখে দিনে ঘুমাইলে ও স্বপ্নদোষ হলে রোযা ভঙ্গ হয় না। — বেহেশতী জেওর

মাসআলা ঃ চোখে সুরমা লাগানো বা ঔষধ ব্যবহার করা বা মাথায়, চুল দাড়িতে বা শরীরে তেল লাগানো অথবা খোশবুর ঘ্রাণ লওয়া দুরুস্ত আছে। এমনকি চোখে সুরমা লাগানোর পর যদি থুথু কিংবা শ্লেষ্মার সাথে সুরমার রং দেখা যায় তবুও রোযা ভঙ্গ হয় না, মাকরূহও হয় না।

—আলমগীরী

মাসআলা ঃ মুখের থুথু যত বেশীই হোক না কেন, তা গিলে ফেললে রোযার কোনই ক্ষতি হয় না। —তাহ্তাবী

মাসআলা ঃ সেহরী খাওয়ার পর পান খাওয়া হলে সুবহে সাদেকের পূর্বেই উত্তমরূপে কুল্লি করে মুখ ছাফ করে নেওয়া উচিত। এর পরও যদি সকালে থুথু কিছু লাল দেখায় তবে এতে রোযা ভঙ্গ হবে না। —বেঃ জেওর

মাসআলা ঃ রোযা অবস্থায় ইনজেকশন বা টীকা নিলে রোযা ভঙ্গ হয়

না।—জাওয়াহেরুল ফিক্‌হ

মাসআলা ঃ নাকের শ্লেষ্মা হলকূমের ভিতরে চলে গেলে রোযা নষ্ট হয় না।— বেহেশতী জেওর

মাসআলা ঃ রোযার কথা ভুলে গিয়ে কিছু খেয়ে ফেললে কিংবা সহবাস হয়ে গেলে রোযার কথা যদি একেবারেই মনে না আসে, তবে এতে রোযা ভঙ্গ হয় না। কিন্তু খাওয়া শুরু করার পর স্মরণ হলে তৎক্ষণার বন্ধ করতে হবে। স্মরণ হওয়ার পর সামান্য কিছু খেলেও রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে।—হেদায়া, আলমগীরী

মাসআলা ঃ আপনা–আপনি বমি হয়ে গেলে বেশী হোক কি কম—এতে রোযা নষ্ট হয় না। —শামী

মাসআলা ঃ আপনা–আপনি সামান্য বমি আপনা–আপনি হলকূমের ভিতর চলে গেলেও রোযা নষ্ট হয় না। অবশ্য যদি ইচ্ছাপূর্বক গিলা হয়, তাহলে কম হলেও রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। অথবা যদি বেশী পরিমাণ আপনা–আপনিই হলকূমের নীচে চলে যায়। তবে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে।—শামী

মাসআলা ঃ কানে পানি টপকাইলে রোযা ভঙ্গ হয় না।—জাঃ ফিক্‌হ

মাসআলা ঃ কাঁচা বা শুকনা মিসওয়াক দ্বারা দাঁত মাজা দুরুস্ত আছে। এমন কি নিমের কাঁচা ডালের দ্বারাও যদি মিসওয়াক করা হয় এবং এর তিক্ততার স্বাদ অনুভব করা হয় এতেও রোযার কোন ক্ষতি হবে না ; মাকরূহও হবে না। —আলমগীরী

যে অবস্থায় রোযা রেখেও ভাঙ্গা যায়

মাসআলা ঃ রোযা অবস্থায় যদি এমন কোন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে যে, কিছু দাওয়া–পানি না খেলে জীবনের আশংকা হতে পারে বা রোগ অত্যন্ত বেড়ে যেতে পারে, যেমন হঠাৎ পেটে বেদনা দেখা দিল এবং একেবারে অস্থির করে ফেললো, সাপে দংশন করলো ঔষধ না খেলে প্রাণ নাশ হতে পারে—এইরূপ অবস্থায় রোযা ছেড়ে দিয়ে ঔষধ সেবন করা জায়েয আছে।

মাসআলা ঃ যদি এমন ভীষণ পিপাসা হয় যে, প্রাণনাশের আশংকা হয়, তবে রোযা ভাঙ্গা জায়েয আছে।

যেসব কারণে রোযা না রাখার অনুমতি আছে

মাসআলা ঃ এমন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যে রোযা রাখলে তার রোগ বেড়ে যাবে কিংবা রোগ দুরারোগ্য হয়ে যাবে কিংবা মারা যাওয়ার আশংকা রয়েছে, তার জন্য রোযা না রেখে সুস্থ হওয়ার পর কাযা করা দুরুস্ত আছে। কিন্তু নিজের কাল্পনিক খেয়ালে রোযা ছেড়ে দেওয়া জায়েয হবে না। মুসলমান দ্বীনদার পরিপক্ক চিকিৎসকের সার্টিফিকেট (সাক্ষ্য) প্রয়োজন হবে।

মাসআলা ঃ আরোগ্য হওয়ার পর দুর্বল অবস্থায় রোযা রাখলে যদি পুনরায় রোগাক্রান্ত হওয়ার প্রবল আশংকা থাকে, তবে তখন রোযা না রেখে পরে কাযা করা জায়েয আছে।

মাসআলা ঃ যারা শরীয়ত অনুসারে মুসাফির, তারা সফরে থাকাকালীন রোযা না রেখে অন্য সময় রাখতে পারে। ৪৮ মাইল বা তদুর্ধ দূরবর্তী স্থানে যাওয়ার ইচ্ছা করে নিজ বাসস্থানের সীমা অতিক্রম করেছে যে ব্যক্তি, তাকে ‘মুসাফির’ বলে।

মাসআলা ঃ সফরে কষ্ট না হলে রোযা রাখাই উত্তম। তবুও যদি না রাখে, (পরে কাযা করে) গোনাহগার হবে না ; অবশ্য রমযানের ফযীলত পাবে না।

মাসআলা ঃ সফরে বের হওয়ার পর বিদেশে কোন স্থানে ১৫ দিন বা এর বেশী অবস্থান করার নিয়ত করলে সে মুসাফির থাকে না ; মুকীম হয়ে যায়। সুতরাং এই মুকীম অবস্থায় তাকে অবশ্যই রোযা রাখতে হবে।

মাসআলা ঃ গর্ভবতী মেয়েলোকের অথবা সদ্যপ্রসূত শিশুর স্তন্যদায়িনীর রোযা রাখলে যদি নিজের বা শিশুর জীবনের আশংকা হয়, তবে তার জন্য রোযা না রাখা দুরুস্ত আছে।

মাসআলা ঃ মেয়েলোকের যদি রোযার মধ্যে হায়েয বা নেফাস উপস্থিত হয়, তবে এ অবস্থায় রোযা রাখা দুরুস্ত নয়। পরে কাযা করে নিবে।

মাসআলা ঃ রাতে যদি মেয়েলোকের হায়েয বন্ধ হয় তবে সকালে রোযা ছাড়বে না। যদি রাতে গোসল না–ও করে থাকে তবুও রোযা রেখে নিবে এবং সকালে গোসল করে নিবে। আর যদি সুবহে সাদেক হওয়ার

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

পর রক্ত বন্ধ হয়, তবে রোযার নিয়ত করা জায়েয হবে না। অবশ্য দিনভর কিছু পানাহার করা দুরুস্ত নাই; রোযাদারের মত থাকবে।

মাসআলা ঃ কোন মহিলা যদি ঋতুরোধক টেবলেট সেবন করে স্রাব বন্ধ রেখে রমযান মাসের রোযা পূর্ণ করে, তবে স্বাস্থ্যের জন্য কোনরূপ ক্ষতির কারণ না হলে এরূপ করা যদিও না–দুরুস্ত হবে না ; কিন্তু বড় কোন উযর বা প্রয়োজন না থাকলে আল্লাহর দেওয়া স্বাভাবিক বিধানই যথাযথ মেনে সে অনুযায়ী আমল করার মধ্যেই খায়র–বরকত রয়েছে। এই ক্ষেত্রে রমযানের পর কাযা করলে রমযানের বরকত থেকেও মাহরূম হবে না।

মাসআলা ঃ সফরের কারণে রোযার নিয়ত করে নাই ; কিন্তু দুপুরের এক ঘন্টা পূর্বে কোন স্থানে ১৫ দিন অবস্থানের নিয়ত করলো এবং এখন পর্যন্ত সে কিছু পানাহার করে নাই। এমতাবস্থায় তার ঐ সময় রোযার নিয়ত করতে হবে।

মাসআলা ঃ রোযার নিয়ত করার পর যদি সফর শুরু করা হয়, তবে এই রোযাটি ছেড়ে দেওয়া জায়েয নয়। এমনিভাবে সকাল বেলায় সফরে যাওয়া হবে—সে জন্যে রোযার নিয়ত না করা জায়েয নয়। এমনিভাবে, মুসাফির রোযার নিয়ত করে থাকলে তার জন্য ঐ রোযাটি ছাড়া জায়েয নয়।

সেহরী

মাসআলা ঃ রোযা রাখার উদ্দেশ্যে শেষ রাতে কিছু খাওয়াকে ‘সেহরী’ বলে। সেহরী খাওয়া সুন্নত। ক্ষুধা না থাকলে অন্ততঃ খোরমা বা অন্য কিছু খাবে বা একটু পানি পান করবে।

মাসআলা ঃ সেহরী যথাসম্ভব দেরী করে খাওয়া ভাল, তবে এতো দেরী নয় যে, সুবহে সাদেক হয়ে যাওয়ার আশংকা হয়।

মাসআলা ঃ যদি ঘুম না ভাঙ্গার কারণে সেহরী খেতে না পারে, তবে এই না–খাওয়া অবস্থাতেই রোযা রেখে নিবে। সেহরী না খাওয়ার কারণে রোযা ছেড়ে দেওয়া গোনাহর কাজ।

মাসআলা ঃ যে পর্যন্ত সুবহে সাদেক না হয়, অর্থাৎ পূর্বাকাশ সাদা বর্ণ

www.banglakitab.weebly.com

www.islamfind.wordpress.com

না দেখা যায়, সে পর্যন্ত সেহরী দুরুস্ত আছে। সুবহে সাদেক হয়ে গেলে আর দুরুস্ত নাই।

মাসআলা ঃ দেরী করে উঠে সুবহে সাদেক হয়ে গেছে সন্দেহ হলে কিছু খাওয়া–দাওয়া মাকরূহ। কিছু খেলে গোনাহগার হবে এবং রোযার কাযা করতে হবে।

ইফতার

মাসআলা ঃ যখন নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, সূর্য অস্ত গেছে, তখন আর দেরী না করে শীঘ্রই ইফতার করা মুস্তাহাব ; দেরী করে ইফতার করা মাকরূহ।

মাসআলা ঃ মেঘের দিনে কিছু দেরী করে ইফতার করা ভাল। শুধু ঘড়ি–ঘন্টার উপর নির্ভর করা ভাল নয়। কারণ, ঘড়ি–ঘন্টারও অনেক সময় ভুল হয়। কারও আযানের উপরও পূর্ণ নির্ভর করবে না। কারণ, মুআয্যিনেরও ভুল হতে পারে। ওয়াক্ত হলো কি–না সন্দেহ হলে ইফতার করা দুরুস্ত নাই।

মাসআলা ঃ খোরমার দ্বারা ইফতার করা সবচেয়ে উত্তম। খোরমা না থাকলে অন্য কোন মিষ্টি জিনিস দ্বারা এবং তা–ও না থাকলে পানি দ্বারা ইফতার করা ভাল।

মাসআলা ঃ ইফতারের মাসনূন দুআ ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَ عَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

"আয় আল্লাহ, আমি আপনার সন্তুষ্টি লাভের জন্য রোযা রেখেছি এবং আপনার দেওয়া রিযিকের দ্বারা ইফতার করছি।"

ইফতার শেষে মাসনুন দুআ ঃ

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَ ثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ

"পিপাসা দূর হলো, শিরা–উপশিরা সিক্ত হলো, পুরস্কার ইনশা–আল্লাহ অবধারিত।" (আবু দাউদ: ২৩৪৭)

তারাবীহ

মাসআলা ঃ সম্পূর্ণ রমযান মাসে প্রত্যেক রাত্রে এশার ফরয ও সুন্নতের পর বিশ রাকআত করে তারাবীহ পড়া সুন্নতে মুআক্কাদা। যে সন্ধ্যায় রময়ানের চাঁদ হবে সেই রাত হতে শুরু করবে এবং যে সন্ধ্যায় ঈদের চাঁদ হবে সেই রাতে ছাড়বে।

মাসআলা ঃ যদি কুরআন শরীফ আগে খতম হয়ে যায়, তবুও অবশিষ্ট রাতগুলোতেও তারাবীহ পড়া সুন্নতে মুআক্কাদা। কেউ কেউ কুরআন খতম হয়ে গেলে জামাআতে আসে না বা তারাবীহ পড়ে না বা কেউ কেউ আট রাকআত পড়েই চলে যায় —এটা ভুল ; এতে তারা গোনাহগার হবে।

মাসআলা ঃ তারাবীহর জামাআত পুরুষদের জন্য সুন্নতে কেফায়া। অতএব, যদি সকলে মিলে জামাআত করে এবং কেউ ঘরে তারাবীহর নামায পড়ে, তবে এতে সুন্নতে কেফায়া আদায় হবে, কিন্তু পাড়ার সকলেই জামাআত তরক করলে সকলেই গোনাহগার হবে।

মাসআলা ঃ তারাবীহর নামাযের মধ্যে পুরা কুরআন শরীফ খতম করা সুন্নতে মুআক্কাদা।

মাসআলা ঃ যদি হাফেযে কুরআন পাওয়া না যায় কিংবা পারিশ্রমিক চায় কিংবা দাড়ি মুণ্ডায় বা ছোট এক মুষ্টির কম রাখে, তবে ছোট ছোট সূরা দিয়ে তারাবীহর নামায আদায় করবে। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কুরআন শুনবে না। কেননা, কুরআন শোনানোর উপর পারিশ্রমিক নেওয়া এবং দেওয়া হারাম।

মাসআলা ঃ মসজিদে এসে দেখা গেল, এশার জামাআত হয়ে গেছে, তবে আগে একা একা এক পার্শ্বে এশা পড়ে নিবে, তারপর তারাবীহর জামাআতে শরীক হবে, এই সময় যে কয় রাকআত তারাবীহ ছুটে গেছে তা তারাবীহ এবং বেতর জামাআতের সঙ্গে পড়ে তারপর পড়বে।

মাসআলা ঃ কুরআন শরীফ এমন জলদি পড়া, যার ফলে হরফ কেটে যায়—বুঝা যায় না বড় গোনাহ। এরূপ হলে ইমামেরও সওয়াব হবে না এবং মুক্তাদীরও সওয়াব হবে না।

মাসআলা ঃ জুমহুর (অধিকাংশ) উলামার ফতওয়া এই যে, নাবালেগকে তারাবীহর নামাযে ইমাম বানানো জায়েয নয়।

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

শবে কদর

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে সূরা কদর নামে একটি স্বতন্ত্র সূরা নাযিল করেছেন—তাতে শবে কদরের গুরুত্ব ও ফযীলত বয়ান করেছেন ঃ "শবে কদরের এক রাত্রি এক হাজার মাস হতে শ্রেষ্ঠ।"

এই উম্মতের আয়ু ও জীবন যেহেতু পূর্ববর্তী উম্মতগণের তুলনায় কম, এ জন্য আল্লাহ তা'আলা দয়া ও মেহেরবানী করে এমন একটি রাত এই উম্মতের জন্য ঠিক করে দিয়েছেন, যে রাতে ইবাদত করার সওয়াব অন্যান্য সময় এক হাজার মাস ইবাদতের চেয়েও বেশী। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এ রাতটিকে গোপন রেখেছেন, যাতে বান্দারা এর তালাশে থাকে এবং অধিক ইবাদতের মাধ্যমে বে-হিসাব নেকীর ভাগী হতে পারে।

রমযানের শেষ দশকে বে-জোড় রাতগুলোতে শবে কদর হওয়ার সম্ভাবনা বেশী অর্থাৎ ২১, ২৩, ২৫, ২৭, ২৯ এর রাতগুলো। আরবী হিসাবে রাতকে আগে ধরা হয়, তাই ২১শের রাতটি বলতে ২০শে রমযান দিবাগত রাতকে বুঝায়—এভাবে বাকীগুলোও বুঝতে হবে।

সর্বাপেক্ষা মশহুর কওল অনুযায়ী ২৭শে রাতেই শবে কদর হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

উত্তম যে, শক্তি সাহস হলে শেষ দশটি রাত্রই জাগরণ করবে, বিশেষতঃ বে-জোড় রাতগুলোর অধিক এহ্তেমাম করবে—বেশী বেশী ইবাদত, তাওবা-ইস্তেগফার ও দুআ-দরূদ ও যিকির- তিলাওয়াতে মশগুল থাকবে। পুরা রাত জাগরণের হিম্মত না হলে যতটুকু সম্ভব ততটুকুর জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করবে না। কিছু না হলে অন্ততঃ এশা ও ফজরের নামায জামাআতের সাথে আদায় অবশ্যই করবে ; হাদীস শরীফে এসেছে, এতটুকু হলেও পুরা রাত জাগরণের ন্যায় হবে।

শবে কদরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দুআটি বেশী বেশী পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ

"হে আল্লাহ, আপনি নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল, ক্ষমা করা আপনি পছন্দ করেন, তাই আমাকে ক্ষমা করে দিন।" —আহমদ, তিরমিযী

ঈদের রাতের ফযীলত

হাদীস ঃ হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "যে ব্যক্তি ঈদুল-ফিতর ও ঈদুল-আযহার রাতে জাগ্রত থেকে আল্লাহ্ ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকবে, সে ব্যক্তির দিল মরবে না, যেদিন অন্যান্য দিল মরবে।" অর্থাৎ কিয়ামতের দিনের আতংকে অন্যান্য লোকের দিল ঘাবড়িয়ে মৃতপ্রায় হয়ে যাবে ; কিন্তু দুই ঈদের রাতে জাগরণকারীর দিল তখন ঠিক থাকবে।" —তাবরানী

হাদীস ঃ হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "যে ব্যক্তি লাইলাতুত্-তারবিয়া (৮ই জিলহজ্জ), লাইলাতুল-আরাফা (৯ই জিলহজ্জ), লাইলাতুন-নহর (১০ই জিলহজ্জ), ঈদুল ফিতরের রাত এবং লাইলাতুল-বরাআত—এই পাঁচ রাত্র জাগ্রত থেকে ইবাদতে মশগুল থাকবে, সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। —মা ছাবাতা বিস্-সুন্নাহ

ফুকাহায়ে কেরাম দুই ঈদের রাত জেগে ইবাদত করাকে মুস্তাহাব লিখেছেন। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, পাঁচটি রাত রয়েছে, এতে দুআ কবূল হয়—জুমার রাত, দুই ঈদের রাত, রজব মাসের প্রথম রাত এবং ১৫ই শাবানের রাত।

এতেকাফ

২০শে রমযান সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ পূর্ব থেকে ২৯/৩০ তারিখ অর্থাৎ ঈদের চাঁদ দেখার তারিখের সূর্যাস্ত পর্যন্ত পুরুষদের জন্য মসজিদে এবং মেয়েদের জন্য নিজ গৃহে নামাযের নির্ধারিত স্থানে পা-বন্দির সাথে অবস্থান করাকে 'এতেকাফ' বলে।

হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি রমযান শরীফের শেষ দশদিন এতেকাফ করবে, এই এতেকাফ তার জন্য দুইটি হজ্জ এবং দুইটি উমরার সমতুল্য হবে। —বায়হাকী

অন্য এক হাদীসে এতেকাফকারীর পূর্ববর্তী গোনাহ মাফ হওয়ার কথাও বর্ণিত হয়েছে।—দাইলামী

মাসআলা ঃ রমযানের শেষ দশদিন এতেকাফ করা সুন্নতে মুআক্কাদা

কেফায়া। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিতভাবে প্রত্যেক রমযানের শেষ দশদিন এতেকাফ করেছেন। কিন্তু এই সুন্নতে মুআক্কাদা কেউ কেউ আদায় করলে সকলেই দায়িত্ব মুক্ত হবে।

মাসআলা ঃ এতেকাফ শুরু করলে পেশাব–পায়খানা কিংবা খাওয়া–দাওয়ার মজবুরী হলে অন্যত্র যাওয়া দুরস্ত আছে। আর যদি খানা–পানি পৌঁছাবার লোক থাকে তবে বাইরে যাওয়া যাবে না।

মাসআলা ঃ এতেকাফ অবস্থায় বেকার বসে থাকা ভাল নয়। কুরআন তিলাওয়াত, নফল নামায, (উমুরী কাযা,) তাসবীহ–তাহলীল সাধ্যমত পড়তে থাকবে এবং ঘুমাবে। মেয়েলোকের হায়েয বা নেফাস্ আসলে এতেকাফ ছেড়ে দিবে। এতেকাফ অবস্থায় সহবাস দুরুস্ত নাই।

মাসআলা ঃ এতেকাফের মসজিদ হতে ভুলেও এক মিনিট বা তদপেক্ষা কম সময়ের জন্য বাইরে থাকতে পারবে না। যে জরুরতের জন্য মসজিদ থেকে বাইরে যাবে ঐ কাজ শেষ হলে আর সেখানে অবস্থান করবে না।

মাসআলা ঃ এতেকাফ অবস্থায় বিনা জরুরতে দুনিয়াদারীর কাজে লিপ্ত হওয়া মাকরূহ তাহ্‌রিমী।

মাসআলা ঃ জুমুআর দিনের গোসলের জন্য কিংবা শুধু ঠাণ্ডা ও আরামের গোসলের জন্য মসজিদ থেকে বাইরে যাওয়া জায়েয নয়।

রোযার কাযা

মাসআলা ঃ কোন কারণবশতঃ রমযানের সব রোযা বা কতেক রোযা যদি রাখতে না পারে, তবে রমযানের পর শীঘ্র ঐ সব রোযার কাযা করতে হবে—বিনা কারণে দেরী করলে গোনাহ্‌গার হবে।

মাসআলা ঃ কাযা করার সময় দিন তারিখ নির্দিষ্ট করবে যে, অমুক দিনের রোযার কাযা করছি—অবশ্য এরূপ করা জরুরী নয়, শুধু যে কয়টি রোযা কাযা হয়েছে, তা রাখলেই হবে। তবে ঘটনাক্রমে যদি দুই রমযানের কাযা রোযা একত্র হয়ে যায়, তাহলে এই ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করে নিয়ত করতেই হবে যে, আজ অমুক বৎসরের রমযানের রোযা কাযা করছি।

www.banglakitab.weebly.com

www.islamfind.wordpress.com

মাসআলা ঃ কাযা রোযার জন্য রাতেই নিয়ত করা জরুরী। সুবহে সাদেকের পর নিয়ত করলে কাযা সহীহ হবে না ; বরং নফল হয়ে যাবে এবং কাযা রোযা শুদ্ধভাবে পুনরায় রাখতে হবে।

মাসআলা ঃ যে কয়টি রোযা ছুটে গেছে, তা সব একাধারে বা বিভিন্ন সময়ে রাখা দুরুস্ত আছে।

মাসআলা ঃ মুসাফির সফর থেকে আসার পর, চিররোগী সুস্থ হওয়ার পর যদি এতটুকু সময় না পায় যার মধ্যে সে ছুটে যাওয়া রোযার কাযা করতে পারে, তবে কাযা তার জন্য জরুরী থাকে নাই। আর যদি সবগুলো কাযা করার অবকাশ না পেলেও কয়েক দিনের পেয়ে থাকে তবে যে কয়দিনের সুযোগ পেল সে কয়দিনের রোযার কাযা করা তার দায়িত্ব।

রোযার কাফ্ফারা

মাসআলা ঃ রমযান শরীফের রোযা ইচ্ছাপূর্বক পানাহার বা স্ত্রী সহবাসের দ্বারা ভঙ্গ হলে কাফফারা দিতে হয়। অর্থাৎ একাধারে দুই মাস অর্থাৎ ৬০টি রোযা রাখতে হবে। মাঝখানে দুই একদিনও বাদ পড়লে আবার শুরু থেকে ৬০টি রাখতে হবে। এমনিভাবে ঈদের দিন ও কুরবানীর দিনও যদি আসে তবু কাফফারা আদায় হবে না। অবশ্য মেয়েলোকের হায়েয আসলে তা মাফ ; কিন্তু হায়েয হতে পাক হওয়ার পরদিন থেকেই আবার রোযা রাখতে হবে এবং ৬০ সংখ্যা পূর্ণ করতে হবে।

মাসআলা ঃ নেফাসের কারণে ভাঙ্গা পড়লে কাফ্ফারা আদায় হবে না।

মাসআলা ঃ রোগের কারণে বাদ পড়লেও সুস্থ হওয়ার পর নতুন ভাবে ৬০টি রোযা পূর্ণ করতে হবে।

মাসআলা ঃ যদি মাঝখানে রমযান মাস আসে তবুও কাফফারা আদায় হবে না।

মাসআলা ঃ যদি কারও কাফফারার রোযা রাখার শক্তি না থাকে তবে এক রোযার পরিবর্তে ৬০ জন মিসকীনকে দুই ওয়াক্ত খুব পেট ভরে

খাওয়াতে হবে।

মাসআলা ঃ পাকান খাদ্য না খাওয়াইয়ে যদি ৬০ জন মিসকীনকে গম বা তার আটা দেয় তা–ও জায়েয আছে। কিন্তু প্রত্যেক মিসকীনকে সদকায়ে ফিতর পরমাণ দিতে হবে।

মাসআলা ঃ যদি একজন মিসকীনকে ৬০ দিন সকাল–বিকাল পেট ভরে খাওয়াইয়ে দেয় বা একই জনকে ৬০ দিন ৬০ বার সদকায়ে ফিতর পরিমাণ গম বা মূল্য দেয় তাতেও কাফফারা আদায় হয়ে যাবে।

রোযার ফিদইয়া

রোযার পরিবর্তে যে সদকা দেওয়া হয়, তাকে 'ফিদইয়া' বলে।

মাসআলা ঃ এতো বৃদ্ধ যে, রোযা রাখার শক্তি নাই বা এতো রোগা বা দুর্বল যে, আর ভাল হওয়ার আশা নাই—এইরূপ লোক প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে দুই ওয়াক্ত পেট ভরিয়ে খাওয়াবে, না হয় একটি রোযার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে সদকায়ে ফিতর পরিমাণ গম বা এ মূল্যের চাউল বা পয়সা দান করবে।

মাসআলা ঃ একটি ফিদইয়া একজন মিসকীনকে দেওয়াই উত্তম। কিন্তু যদি কয়েকজনকে কিছু কিছু করে দেওয়া হয়, তা–ও দুরুস্ত আছে।

মাসআলা ঃ বৃদ্ধ বা চিররোগী যদি পুনরায় রোযা রাখার শক্তি পায়, তবে যেসব রোযার ফিদইয়া দিয়েছে সেগুলো কাযা করতে হবে। ফিদইয়ার সওয়াব পৃথকভাবে পাবে।

মাসআলা ঃ যার যিম্মায় কাযা থাকে, মৃত্যুর পূর্বে তার ওসীয়ত করে যেতে হবে, এইরূপ ওসীয়ত করে গেলে পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে তা আদায় হবে।

মাসআলা ঃ মৃত ব্যক্তি ওসীয়ত না করে গেলে ওলী–ওয়ারিসরা যদি ফিদইয়া দেয়, তবুও আশা করা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা নিজ দয়াগুণে ক্ষমা করে দিবেন।

সদকায়ে ফেতরের মাসায়েল

মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি ঈদের দিন সুবহে সাদেকের সময় হাওয়ায়েজে

আছলিয়া অর্থাৎ জীবিকা নির্বাহের অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ যথা–প্রয়োজনীয় কাপড়–চোপড়, শোয়ার জন্য ঘর এবং খাদ্যদ্রব্য ব্যতীত সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা অথবা সমমূল্যের অন্য কোন মালের মালিক থাকবে—এই মাল তেজারত বা ব্যবসায়ের জন্য হোক বা না হোক বা সে মালের উপর বৎসর অতিবাহিত হোক বা না হোক—সেই ব্যক্তির উপর সদকায়ে ফেতর দেওয়া ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ যদি কেউ ঋণগ্রস্ত থাকে, তবে ঋণ বাদে যদি নেসাবের মালিক (অর্থাৎ জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনীয় উপকরণের অতিরিক্ত সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা কিংবা সমমূল্যের মালের মালিক) হয়, তবে ফেতরা ওয়াজিব হবে নতুবা নয়।

মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি দুটি বাড়ীর মালিক হয়, এক বাড়ীতে নিজে সন্তানাদি নিয়ে বসবাস করে, অপরটি খালি পড়ে থাকে অথবা ভাড়া দিয়ে রাখা হয়েছে, তবে দ্বিতীয় বাড়ীটাকে অতিরিক্ত বলা হবে। কাজেই দেখতে হবে—বাড়ীটার মূল্য সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার সমান বা তার চেয়ে বেশী হয় কিনা। যদি সমান বা বেশী হয়, তবে তার উপর সদকায়ে ফেতর ওয়াজিব হবে। এরূপ ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া জায়েয নাই। কিন্তু যদি এই বাড়ীটার ভাড়ার উপরই তার জীবিকা নির্বাহ নির্ভর করে, তবে বাড়ীটাকে অতিরিক্ত বলা যাবে না এবং তার উপর সদকায়ে ফেতর ওয়াজিব হবে না। এমন ব্যক্তি সদকায়ে ফেতর নিতে পারে। তাকে সদকায়ে ফেতর দেওয়াও জায়েয আছে।

মাসআলা ঃ স্ত্রীলোকের জেওর (অলংকারাদি) অত্যাবশ্যকীয় উপকরণাদির অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব, যে স্ত্রীলোকের নিকট সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা কিংবা সমমূল্যের জেওর (অলংকার) থাকবে তার উপর ফেতরা ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ ঈদের নামাযের পূর্বেই সদকায়ে ফেতর দেওয়া মুস্তাহাব। যদি নামাযের পূর্বে দিতে না পারে, তবে পরে দিবে। পরে দিলেও আদায় হয়ে যাবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি ঈদের দিনের পূর্বেই রমযান মাসের মধ্যে সদকায়ে ফেতর দিয়ে দেয়, তবে তাও দুরুস্ত আছে ; ঈদের দিন

www.banglakitab.weebly.com

www.islamfind.wordpress.com

পুনরায় দিতে হবে না।

মাসআলা ঃ যদি কেউ ঈদের দিনেও ফেতরা দিল না, তবে তার ফেতরা মাফ হয়ে যাবে না; অন্য সময় দিতে হবে।

মাসআলা ঃ সাবালক পাগল সন্তানের পক্ষ থেকে সদকায়ে ফেতর দেওয়া পিতার উপর ওয়াজিব।

মাসআলা ঃ সন্তান নাবালেগ হলে পিতার উপর তাদের ফেতরা দেওয়া ওয়াজিব। আর বালেগ হলে এবং এক পরিবারভুক্ত থাকলে তাদের ফেতরা, স্ত্রীর ফেতরা এবং পিতামাতা থাকলে তাদের ফেতরা দেওয়া মুস্তাহাব।

মাসআলা ঃ স্ত্রীলোক মালেকে-নেছাব হলে তার উপর শুধু নিজের ফেতরা দেওয়া ওয়াজিব। স্বামী, সন্তান, পিতামাতা বা অন্য কারও পক্ষ থেকে ফেতরা দেওয়া ওয়াজিব নয়।

মাসআলা ঃ নাবালেগ সন্তানের নিজস্ব সম্পদ থাকলে তাদের সম্পদ থেকে ফেতরা দিতে হবে। আর সম্পদ না থাকলে পিতা নিজের সম্পদ থেকে দিবে।

মাসআলা ঃ ফেতরা এবং রোযা দুইটি পৃথক পৃথক ইবাদত ; একটির সাথে অপরটির কোন সংশ্রব নাই। অতএব, যারা রোযা রাখে নাই, তাদের উপরও ফেতরা ওয়াজিব।

মাসআলা ঃ গম বা গমের আটা বা গমের ছাতু দ্বারা যদি ফেতরা আদায় করা হয়, তবে আধা ছা' অর্থাৎ আশি তোলার সেরে এক সের সাড়ে বার ছটাক দিতে হবে। কিন্তু পূর্ণ দুই সের দিয়ে দিলে ক্ষতি নাই। কেননা বেশী দিলে বেশী সওয়াব হবে। পক্ষান্তরে কম হলে ফেতরা আদায় হবে না। আর যব বা যবের ছাতু দ্বারা ফেতরা আদায় করলে পূর্ণ এক ছা' অর্থাৎ তিন সের নয় ছটাক দিতে হবে ; পূর্ণ চার সের দেওয়া উত্তম।

মাসআলা ঃ যদি কেউ গম বা যব দ্বারা ফেতরা না দিয়ে ধান, চাউল, বুট, কলাই ইত্যাদি দ্বারা ফেতরা আদায় করতে চায়, তবে বাজার দরে উপরোল্লিখিত পরিমাণ গম বা যবের যে মূল্য হয়, সেই মূল্যের চাউল, ধান, বুট ইত্যাদি দিলে ফেতরা আদায় হয়ে যাবে।

মাসআলা ঃ গম বা যব না দিয়ে যদি কেউ উপরোল্লিখিত পরিমাণ

গম বা যবের মূল্য নগদ টাকা-পয়সা দিয়ে দেয়, তবে তা উত্তম।

মাসআলা ঃ একজনের ফেতরা একজন গরীবকে দেওয়া কিংবা কয়েকজন গরীবকে ভাগ করে দেওয়া উভয়ই জায়েয আছে।

মাসআলা ঃ যদি কয়েকজনের ফেতরা একজন গরীবকে দেওয়া হয়, তা-ও দুরুস্ত আছে।

মাসআলা ঃ যাদের জন্য যাকাত গ্রহণ করা জায়েয, তাদেরকে ফেতরা দেওয়া যাবে।

মাসআলা ঃ আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী এবং পার্শ্ববর্তী গরীব লোকদেরকে ফেতরা দেওয়া যাবে। সাইয়েদ, মালদার, মালদারের নাবালেগ সন্তানকে ফেতরা দেওয়া জায়েয নয়। এমনিভাবে নিজের পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী বা নিজের ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনী— এদেরকে ফেতরা দেওয়া জায়েয নয়। অবশ্য এরা গরীব হলে হাদিয়া-তোহফা বা সাধারণ দানস্বরূপ পৃথকভাবে দিয়ে তাদের সাহায্য করতে হবে।

ঈদুল ফিতর

'সিয়াম'-এর বিপরীত ব্যবহৃত 'ফিতর' শব্দটির অর্থ হলো রোযার অবসান। রমযানের দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর পহেলা শাওয়াল ঈদের দিন তথা আল্লাহর পক্ষ থেকে আজকে বান্দার জিয়াফত ও দাওয়াতের দিন। আজকে রোযা রাখা যাবে না ; খোদ শরীয়ত কর্তৃক নিষেধ ও হারাম। আজকে আল্লাহর দাওয়াতেই সাড়া দিতে হবে। তিনি পুরস্কৃত করবেন আজকে তাদেরকে, যারা সিয়াম সাধনা করেছে, রাতে ইবাদত করেছে, আল্লাহকে স্মরণ করেছে, তাঁর হুকুম পালন করেছে।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ "যখন তাদের (রোযাদার বান্দাদের) ঈদের দিন হয় অর্থাৎ ঈদুল ফিতরের দিন, তখন আল্লাহ তাআলা রোযাদার বান্দাদের সম্পর্কে ফেরেশতাগণের সাথে গর্ব করে জিজ্ঞাসা করেন, হে আমার ফেরেশতাগণ! বল দেখি, আমার কর্তব্যপরায়ণ প্রেমিক বান্দার বিনিময় কি হবে? ফেরেশতাগণ বলেন, হে প্রভু! পূর্ণরূপে তার

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

পারিশ্রমিক দান করাই তো তার প্রতিদান। আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা–বান্দিরা তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করেছে, অতঃপর আমার কাছে দু'আ করতে করতে ঘর থেকে বের হয়ে (ঈদগাহে) গমন করেছে। আমার সম্মান, মর্যাদা, দয়া, বড়ত্ব ও মহানত্বের কসম, জেনে রাখ—আমি তাদের দু'আ কবূল করবো। অতঃপর বলেন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা এখন যেতে পার, আমি তোমাদের পাপসমূহকে নেকীর দ্বারা পরিবর্তন করলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে বাড়ী ফিরে আসে। —বায়হাকী

ঈদের দিনের ১৩টি সুন্নত

(১) শরীয়তের সীমার ভিতর থেকে সাধ্যানুযায়ী সজ্জিত হওয়া (২) মেসওয়াক করা (৩) গোসল করা (৪) সামর্থ্য অনুযায়ী উত্তম (অথবা ধৌত করা) পোশাক পরিধান করা (৫) খোশবু (আতর) ব্যবহার করা। (৬) অতি প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠা (৭) ফজরের নামাযের পর অতি শীঘ্রই ঈদগাহে উপস্থিত হওয়া (৮) ঈদুল ফেতরের দিনে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে খোরমা অথবা অন্য কোন মিষ্টি দ্রব্য খাওয়া। (ঈদুল আযহার দিনে নামাযের পূর্বে কিছু না খাওয়া মোস্তাহাব।)

(৯) ঈদুল ফেতরে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বেই সদকায়ে ফেতর আদায় করে দেওয়া। (ঈদুল আযহায় সদকায়ে ফেতর নাই, বরং নেছাবধারী ব্যক্তিদের উপর এই দিনে কুরবানী করা ওয়াজিব।)

(১০) কোন ওযর অসুবিধা না থাকলে ঈদের নামায মসজিদে না পড়ে (ঈদগাহে) ময়দানে পড়া।

ওযর অসুবিধা বলতে—অনবরত বৃষ্টি থাকা, অসুস্থতার দরুন দূরের ময়দানে যেতে না পারা ইত্যাদিকে বুঝায়।

(১১) ঈদগাহে এক পথে যাওয়া এবং অন্য পথে ফিরে আসা।

(১২) ঈদগাহে হেঁটে যাওয়া।

(১৩) ঈদগাহের পথে—ঈদুল ফেতরে অনুচ্চস্বরে (এবং ঈদুল আযহায় উচ্চস্বরে) এই তাকবীর পড়তে পড়তে যাওয়া ঃ **আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা' ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হাম্‌দ।**

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

ঈদের নামাযের নিয়ত

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, নিয়তের আসল হাকীকত ও প্রকৃত অর্থ হলো অন্তরে ইচ্ছা করা, সংকল্প করা। তাই নিয়তের অস্তিত্বের জন্য শব্দ ও বাক্যের মাধ্যমে মুখে উচ্চারণ না করে অন্তরে উদ্দিষ্ট ইবাদতের ইচ্ছা ও সংকল্প করলেই যথেষ্ট হয়। অবশ্য অতি একাগ্রতার জন্য মুখে উচ্চারণ করলেও দোষ নাই, বরং ভাল। আর তা যে কোন ভাষায় উচ্চারণ করে নিয়ত করলেও নিয়ত দুরুস্ত হবে।

আরবী ভাষার বিশেষ ফযীলত ও মহব্বতের কারণে যদি কেউ আরবীতে উচ্চারণ করে নিয়ত করে, তবে তাও খুবই ভাল কথা। কিন্তু জরুরী মনে করা, অর্থাৎ আরবীতে নিয়ত না করলে নিয়ত দুরুস্ত হবে না, এটা ঠিক নয়। যেমন অনেককেই দেখা যায়, আরবীতে উচ্চারণ করে নিয়ত করার পিছনে পড়ে থাকার কারণে জামাতের সাথে তাদের রুকু বা পূর্ণ রাকআত এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে গোটা জামাআতই ছুটে যায়। তারা এভাবে অনেক বড় ফযীলত থেকে মাহরূম থেকে যায়। এমন ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে নিয়ত তথা মনের ইচ্ছা বা সংকল্পের উপর ভিত্তি করেই জামাআতের সাথে শরীক হয়ে যাওয়া চাই। কেননা এভাবে নিয়ত করলেও শরীয়তের দৃষ্টিতে নিয়তে কোন ত্রুটি বা অপূর্ণতা থেকে যায় না। সুতরাং এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

আরবী নিয়ত

ঈদুল ফিতরের নামাযের আরবী নিয়ত এই ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الْعِيْدِ الْفِطْرِ مَعَ سِتِّ تَكْبِيْرَاتٍ وَاجِبُ اللّٰهِ تَعَالٰى اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ ـ

বাংলা নিয়ত

"আমি ঈদুল ফেতরের/ঈদুল আযহার দুই রাকআত নামায অতিরিক্ত ছয় তাকবীর সহ পড়ছি।"

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

আরবী নিয়ত না করে এভাবে বাংলায় নিয়ত করলেও তা দুরুস্ত হবে।

ঈদের নামায পড়ার নিয়ম

ঈদের নামাযের নিয়তের পর ঃ

প্রথম রাকআতে তাকবীরে তাহরীমা পড়ে যথারীতি হাত বাঁধবে এবং 'সম্পূর্ণ ছানা' (সুবহানাকা) পড়বে। (ছানার পর আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়বে না।)

অতঃপর ঃ

* কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত ছেড়ে দিবে। তিনবার 'সুবহানাল্লাহ' পড়া যায়, এই পরিমাণ সময় দেরী করে

* পূর্বের মত কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত ছেড়ে দিবে এবং তিনবার সুবহানাল্লাহ পরিমাণ সময় দেরী করে—

* আবার কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলবে। কিন্তু এবার কান থেকে হাত নামিয়ে ছেড়ে দিবে না, বরং বেঁধে নিবে। (এখানে অতিরিক্ত তিন তাকবীর হয়ে গেল)

এভাবে হাত বাঁধবার পর মুকতাদীগণ আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ না পড়ে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকবেন। আর ইমাম ছাহেব আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা-কেরাআত পড়ে যথারীতি প্রথম রাকআত শেষ করবেন।

দ্বিতীয় রাকআত—

যথারীতি সূরা ফাতেহা ও কেরাআত শেষ করার পর, রুকুতে না যেয়ে ঃ

* কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত ছেড়ে দিবে। তিনবার 'সুবহানাল্লাহ' পরিমাণ সময় দেরী করে

* পূর্বের মত কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত ছেড়ে দিবে, এবং তিনবার 'সুবহানাল্লাহ' পরিমাণ দেরী করে—

* আবার কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত ছেড়ে

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

দিবে। (এখানে অতিরিক্ত আরও তিন তাকবীর হয়ে মোট অতিরিক্ত ছয় তাকবীর হয়ে গেল) অতঃপর আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে যাবে এবং যথারীতি দ্বিতীয় রাকআত পড়ে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবে।

যাকাত

সম্পদের উপর বছর পূর্তি হওয়ার পর যাকাত ফরয হয়। তবে শরীয়তে যেহেতু অগ্রিম যাকাত প্রদান জায়েয আছে এবং এতে যাকাত আদায় হয়ে যায়, তাই রমযান মাসে এক ফরয আদায় করে সত্তর ফরযের সওয়াব এবং এ ছাড়াও রমযানের আরও ফযীলত হাসিল করার জন্য সাধারণতঃ এ মাসেই যাকাত দেওয়া হয়ে থাকে। আল্লাহর কাছে যাকাত কবূল হওয়া এবং প্রতিশ্রুত সওয়াব ও পুরস্কারে ভূষিত হওয়ার জন্য প্রধান শর্ত হলো, এখলাস তথা সর্বপ্রকার লৌকিকতা, যশ–খ্যাতি ও পার্থিব স্বার্থ–উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত হয়ে একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলার রেজা ও সন্তুষ্টি বিধান।

যাকাত ইসলামের পাঁচ ভিত্তির অন্যতম। এর ফরযিয়তকে অস্বীকারকারী দ্বীন–ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়। আর ফরয হওয়া সত্ত্বেও যে যাকাত আদায় করে না, সে মারাত্মক গোনাহগার ফাসেক হয়। কিয়ামতের দিন তার কঠোর শাস্তি ও ভীষণ আযাব ভোগ করতে হবে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ "যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং আল্লাহর পথে খরচ করে না, (হে নবী!) আপনি তাদেরকে কঠোর আযাবের সুসংবাদ (তিরস্কারস্বরূপ ব্যবহৃত) শুনিয়ে দিন। তাদের (সম্পদ) জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং এ দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ করা হবে (এবং বলা হবে—) এগুলো তা–ই যা তোমরা নিজেদের জন্যে জমা রেখেছিলে। সুতরাং এক্ষণে আস্বাদ গ্রহণ কর যা জমা করে রেখেছিলে।

—সূরা তাওবা ঃ ৩৪, ৩৫

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, "যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা সম্পদ দিয়েছেন অথচ সে যাকাত আদায় করে নাই, কিয়ামতের দিন আল্লাহর

www.banglakitab.weebly.com
সূচীপত্র
www.islamfind.wordpress.com

হুকুমে ঐ সম্পদের দ্বারা অতি বিষাক্ত সাপ বানানো হবে এবং সেই সাপ ঐ ব্যক্তির গলা পেঁচিয়ে ধরে উভয় গালে দংশন করতে থাকবে আর বলতে থাকবে ঃ আমি তোমার সম্পদ, আমিই তোমার সঞ্চিত ধন।”

পক্ষান্তরে, সঠিক হিসাব করে নিয়মিত যাকাত আদায়ের দ্বারা মালের ময়লা দূর হয়ে মাল স্বচ্ছ–পরিষ্কার হয়, মালের হিফাযত হয়—যাবতীয় আসমানী যমীনি বালা থেকে সম্পদ সংরক্ষিত থাকে, সম্পদের দ্বারা মালিকের কোন রকমের ক্ষতি হয় না, যাকাত আদায়কারীর দ্বীন পরিপূর্ণ হয়, ঈমানের স্বাদ আস্বাদনের তাওফীক হয়, সম্পদের হক আদায় হয়ে যায়। আরও অসংখ্য অগণিত পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ ও উপকারিতা রয়েছে, যা হাদীসের কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

—দ্রষ্টব্য ঃ ফাযায়েলে সাদাকাত

যাকাত কার উপর কিসের উপর ফরয

মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা অথবা সাড়ে সাত তোলা সোনার কিংবা এই মূল্যের টাকা কিংবা নোটের মালিক হয় এবং তার নিকট ঐ পরিমাণ মাল পূর্ণ এক বৎসর সময় স্থায়ী থাকে, তার উপর যাকাত ফরয হয়। এই মালকে ‘নেছাব’ বলে এবং মালিককে ‘ছাহেবে নেছাব’ বলে। —শামী

মাসআলা ঃ যদি কারও নিকট নেছাব পরিমাণ মাল ৪/৫ মাস থাকে, তারপর কম হয়ে যায় এবং ২/৩ মাস কম থাকে, তারপর আবার নেছাব পুরা হয়ে যায়, তবে তার যাকাত দিতে হবে। মোটকথা, বছরের শুরু ও শেষ দেখতে হবে। —আলমগীরী

মাসআলা ঃ যদি কিছু সোনা এবং কিছু রূপা থাকে, কিন্তু পৃথকভাবে একটিরও নেছাব পূর্ণ হয় না, তবে উভয়ের মূল্য যোগ করলে যে-কোন একটির হিসাবে নেছাব পুরা হয়, তবে যাকাত ফরয হবে। —আলমগীরী

মাসআলা ঃ তেজারতের মাল যদি সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্যের সমান থাকে, তবে এগুলোর যাকাত দিতে হবে। —হেদায়া

মাসআলা ঃ কারখানা এবং মিল ইত্যাদির মেশিনের উপর যাকাত ফরয নয়। তবে এগুলোতে যে মাল তৈরী হয়, সেগুলোর উপর যাকাত

ফরয। এমনিভাবে, কাঁচা মাল যা কারখানাতে পাকা মাল তৈরীর জন্য রাখা থাকে, সেগুলোর উপরও যাকাত ফরয। —শামী

মাসআলা ঃ সোনা এবং রূপা যে–কোন অবস্থায় থাকুক না কেন, মাটির নীচে পোতা, কারবারে, সরকারের কাছে বা অন্য কারও নিকট করয হিসাবে থাকুক, জেওর (অলংকার) আকারে থাকুক এবং তা ব্যবহারে থাকুক বা আজীবন বাক্সে তোলা থাকুক, কাপড়ে, টুপিতে, তলোয়ারে বা জুতায় কারুকার্যরূপে থাকুক—এতে যাকাত ফরয হবে।

—বেহেশতী জেওর

মাসআলা ঃ কারও নিকট যদি কিছু পরিমাণ সোনা বা রূপার জেওর (অলংকার), কিছু পরিমাণ টাকা এবং কিছু পরিমাণ ব্যবসায়ের মাল থাকে—সবকিছুর মূল্য যোগ করলে যদি নেছাব পরিমাণ হয়, তবে যাকাত ফরয হবে। —হেদায়া, জাওয়াহেরুল ফিকহ

মাসআলা ঃ মিল, কোম্পানী ইত্যাদির শেয়ার যদি নেছাব পরিমাণ হয়, তবে যাকাত ফরয হবে। নিজের অন্যান্য মালের সাথে হিসাব করে নেছাব পরিমাণ হলেও যাকাত ফরয হবে। বছরান্তে যাকাত দেওয়ার সময়ের মূল্য ধর্তব্য হবে। কোম্পানীর অফিস–বিল্ডিং, মেশিন, ফার্নিচার ইত্যাদির মূল্য যেহেতু শেয়ারের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাই কোম্পানী থেকে জেনে আপন অংশ থেকে এগুলোর মূল্য বাদ দিয়ে যাকাতের হিসাব করার অনুমতি আছে। —জাওয়াহেরুল ফিকহ

মাসআলা ঃ প্রভিডেন্ট ফাণ্ড যা এখনও ওসূল হয় নাই, এর উপর যাকাত ফরয নয়। কিন্তু চাকুরী ছাড়ার পর প্রাপ্ত টাকা যদি নেছাব পরিমাণ হয়, তখন যাকাত ফরয হবে। পিছনের বছরগুলোর যাকাত দিতে হবে না। —জাওয়াহেরুল ফিকহ

মাসআলা ঃ মালেকে নেছাব যদি পূর্ণ বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই অগ্রিম যাকাত আদায় করে দেয়, তবে তা–ও দুরুস্ত আছে।

মাসআলা ঃ মালেকে নেছাব যদি কয়েক বৎসরের যাকাত অগ্রিম দিয়ে দেয়, তবে তা–ও দুরুস্ত আছে। কিন্তু যে কয়েক বৎসরের যাকাত অগ্রিম দিয়েছে, তার মধ্যে কোন বৎসরের মাল যদি বেড়ে যায়, তবে যত টাকা বেড়েছে তার যাকাত হিসাব করে পুনরায় দিতে হবে। —জাঃ ফিকহ

যাকাত আদায় করার নিয়ম

মাসআলা ঃ বছরের হিসাব চাঁদের মাস হিসাবে ধর্তব্য হবে। মালের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ দিতে হবে অর্থাৎ একশত টাকায় আড়াই টাকা, চল্লিশ টাকায় এক টাকা। —আলমগীরী

মাসআলা ঃ যাকাতের মাল যখন গরীব মিসকীনের হাতে দিবে তখন মনে মনে এই খেয়াল (নিয়ত) করবে যে, এই মাল আমি যাকাত বাবত দিচ্ছি। দেওয়ার সময় এইরূপ নিয়ত মনে মনে না থাকলে যাকাত আদায় হবে না ; পুনরায় নিয়ত সহ দিতে হবে। —হেদায়া, শামী

মাসআলা ঃ যদি কোন গরীবকে পুরস্কার বা বখশিশ বা হাদিয়া বলে যাকাতের মাল দেওয়া হয়, কিন্তু মনে মনে যাকাতের নিয়ত থাকে, তবে এতেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে। —জাওয়াহেরুল ফিকহ

মাসআলা ঃ কোন গরীবের নিকট (উদাহরণতঃ) দশ টাকা পাওনা ছিল এবং নিজের মালের যাকাতও হিসাবে দশ টাকা বা এর বেশী হয়। এতে যদি যাকাতের নিয়তে সেই পাওনা মাফ করে দেওয়া হয়, তবে যাকাত আদায় হবে না। অবশ্য তাকে যাকাতের নিয়তে দশ টাকা দিলে যাকাত আদায় হবে। এখন এই টাকা তার নিকট থেকে করজ শোধ বাবত নেওয়া দুরুস্ত আছে। —জাওয়াহেরুল ফিকহ

মাসআলা ঃ যাকাতের টাকা গরীবদের নিজের হাতে না দিয়ে অন্য কাউকে উকিল বানিয়ে তার মাধ্যমে দেওয়া দুরুস্ত আছে। —হেদায়া

মাসআলা ঃ আপনার বলা ব্যতিরেকে কেউ আপনার পক্ষ থেকে যাকাত দিয়ে দিলে যাকাত আদায় হবে না ; পরে আপনি মঞ্জুর করলেও হবে না। —আলমগীরী

সমাপ্ত

www.banglakitab.weebly.com সূচীপত্র www.islamfind.wordpress.com

সংগ্রহে রাখার মত কয়েকখানা
রিয়াযুস সালেহীন
রমযানুল মুবারকের উপহার
শবে বরাত
করণীয় ও বর্জনীয়
কুরবানীর ফাযায়েল ও মাসায়েল
MAKTABATUL-ASHRAF